দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল
রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে দুর্নীতিগ্রস্ত, পরিবারতান্ত্রিক দলগুলি — পৃঃ ৩৫

নেপালে সেই পুরনো শকুনের থাবা
বিভাজনের ডলার বাহিনীর তাণ্ডব — পৃঃ ১১

৭৮ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।। ১২ আশ্বিন, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

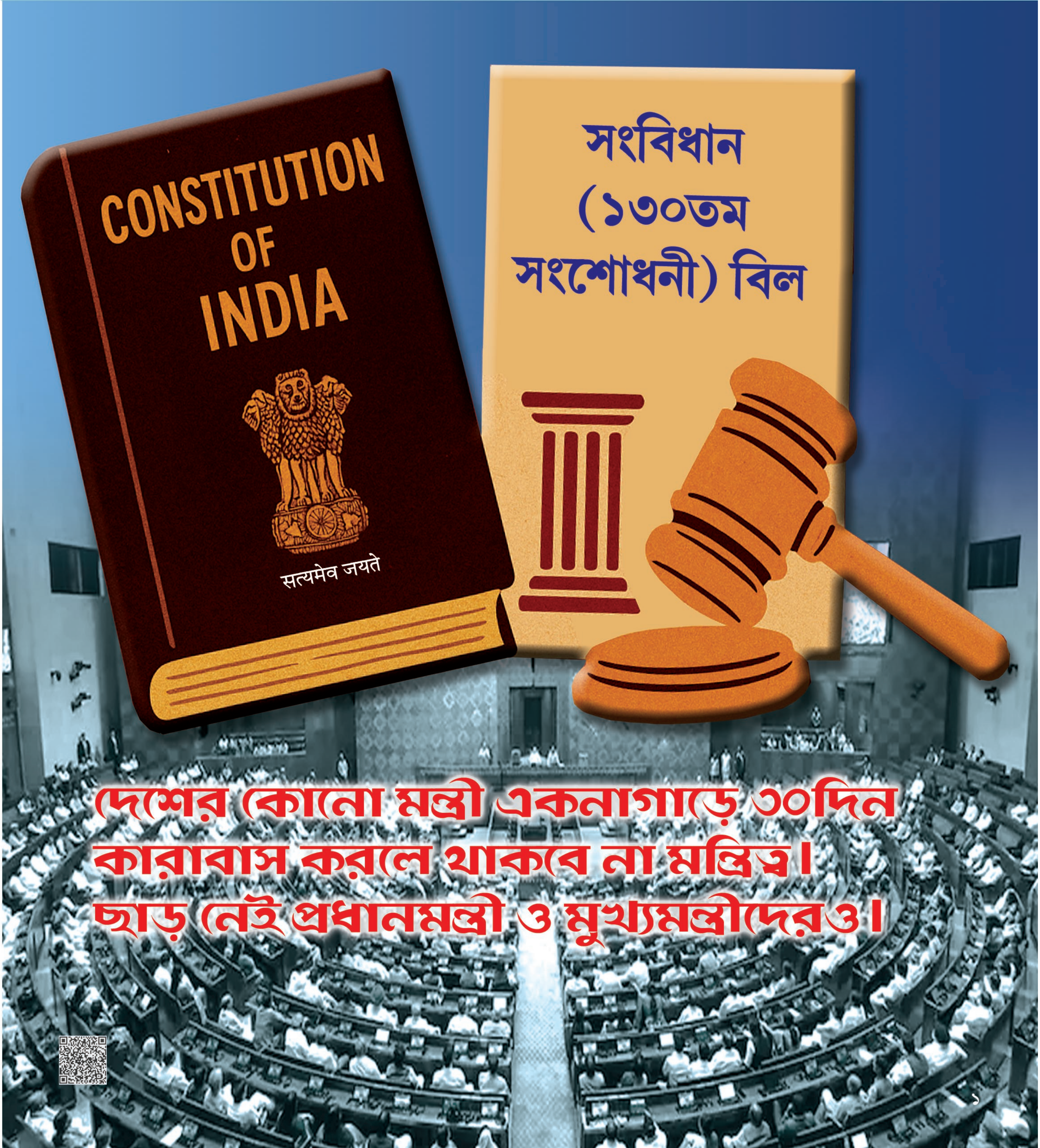

দেশের কোনো মন্ত্রী একনাগাড়ে ৩০দিন কারাবাস করলে থাকবে না মন্ত্রিত্ব। ছাড় নেই প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদেরও।

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১২ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৯ সেপ্টেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

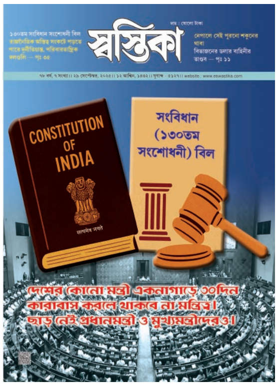

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মুখ্যমন্ত্রী কেন মানছেন না যে চাইলেই ভোটার বা নাগরিক হওয়া যায় না শিশুসুলভ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ফাঁদ পাতছে কেন্দ্র ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর জোরালো সমর্থক মোহনরাও ভাগবত ◻ নরেন্দ্র মোদী ◻ ৮

'ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫'-এ স্থগিতাদেশ না দেওয়া সর্বোচ্চ আদালতের সঠিক সিদ্ধান্ত ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

নেপাল : সেই পুরনো শকুনের থাবা, বিভাজনের ডলার বাহিনীর তাণ্ডব ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১১

গৃহমন্ত্রীর 'মুণ্ডচ্ছেদ'-এর বার্তা : মহুয়া মৈত্রের পশ্চাতে কাহারা? ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ◻ ১৩

গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত মন্ত্রীদের পদচ্যুতি : একশত ত্রিশতম সংশোধনী বিলের প্রয়োজনীয়তা ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১৬

নির্মলা সীতারমণের জিএসটি-র নতুন রূপরেখা মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিল ◻ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ◻ ১৭

এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হলো, স্বচ্ছ হলো কি? ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ১৮

পুণ্যশ্লোক, পবিত্র ঋষি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ৩১

রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা শিশুশিক্ষা উপযোগী পুস্তক ◻ সুতপা বসাক ভড় ◻ ৩৩

পাঁশকুড়ায় ভট্টাচার্য পরিবারের পাঁচশো বছরের প্রাচীন দুর্গাপূজা ◻ জয়জ্যোতি ভট্টাচার্য ◻ ৩৪

সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিল, রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে দুর্নীতিগ্রস্ত, পরিবারতান্ত্রিক দলগুলি ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ৩৫

ঘুষ বা আর্থিক সাহায্য নেওয়া কংগ্রেসিদের কাছে জলভাত ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৩৮

'বেঙ্গল ফাইলস্' বঙ্গের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়কে নতুন করে তুলে ধরেছে ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৪৩

পশ্চিমবঙ্গেও শুরু এসআইআর-এর প্রস্তুতি, সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের শাসকদল ◻ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ◻ ৪৫

ভারতকে বাঁচাতে হলে অনুপ্রবেশে লাগাম দেওয়া জরুরি ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৪৭

কালার রেভোলিউশন : ক্ষমতা বদলের আমেরিকান কৌশল কি এবার ভারতে? ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

প্রকাশিত হবে
২০ অক্টোবর
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২০ অক্টোবর
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শতবর্ষে সঙ্ঘ

আগামী সংখ্যা হলো দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা। কালীক্ষেত্র বঙ্গভূমি। 'ভারতে শক্তি সাধনার ধারা'— বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধের সঙ্গে এই সংখ্যায় উপস্থাপিত হবে শতবর্ষে সঙ্ঘকাজের উপলব্ধি, সঙ্ঘের একশো বছরব্যাপী যাত্রা এবং বঙ্গের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্য বিষয়ে অনুভবী কার্যকর্তাদের অভিজ্ঞতা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নূতন ভারত

দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বহু বৎসর অবধি ভারতবাসী উন্নয়নের কোনো স্বাদ পরখ করিতে পারে নাই। কেননা দীর্ঘদিন দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার নীতিপঙ্গুত্বে ভুগিয়াছে। তাহার উপরে স্বজনপোষণ ও আর্থিক কেলেঙ্কারি কংগ্রেসের সহিত সমার্থক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীন ভারতে প্রথম দুর্নীতি জিপ কেলেঙ্কারি হইতে শুরু করিয়া প্রায় প্রতিটি দশকে এইরূপ কেলেঙ্কারি ঘটিয়াছে। ভারতের প্রাচীনতম এই রাজনৈতিক দলটির শাসনকালে গত সত্তর বৎসরে দেশের এক বিশাল পরিমাণ অর্থের ক্ষতি হইয়াছে। দলটির আশীর্ষ নেতা-নেত্রী এমনভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে বিগত শতাব্দীর আশির দশকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে সখেদে বলিতে হইয়াছিল, জনসাধারণের কল্যাণ ও দারিদ্র্যমোচনের নিমিত্ত এক টাকা কেন্দ্র হইতে পাঠাইলে মানুষের নিকট পৌঁছয় পনেরো পয়সারও কম। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কংগ্রেস শাসনে দীর্ঘদিন মানুষ উন্নয়নের কোনোপ্রকার স্বাদ আস্বাদন করিতে পারে নাই। কংগ্রেস শাসনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার নজর দেওয়া হয় নাই। তাহার ফলে বৈদেশিক শত্রু দেশের ভূমি জবরদখল করিয়া সর্বদা ভারতের প্রতি রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিয়াছে। স্বাধীনতার সত্তর বৎসরেও তাহারা বলিষ্ঠ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন মনে করে নাই। তাহার ফলে দেশাত্মবোধে ভরপুর স্বাভিমানী প্রজন্ম তৈরি হয় নাই। এককথায় বলিতে গেলে কংগ্রেস এমন একটি সরকার পরিচালনা করিয়াছিল যেখানে মিথ্যা, প্রতারণা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ সবকিছুই উর্বর ভূমি পাইয়াছিল। কংগ্রেস শাসনের মূল নীতিই ছিল ‘পরিবার প্রথম’। ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, বিগত এক দশকের অধিক সময় যাবৎ দেশের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিতেছে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁহার সরকারের মূল নীতি হইল, ‘নেশন ফার্স্ট’। ২০১৪ সালের পর হইতে দেশ এক নূতন নীতি দেখিতে শুরু করিয়াছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেশবাসী উন্নয়নের স্বাদ পাইয়াছে। দেশকে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করিবার সর্বপ্রকার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং তাহা বহুলাংশে রূপায়িতও হইয়াছে। কোটি কোটি দেশবাসীর নিকট ব্যাংকের পাশবহির ব্যবস্থার দরুন সরকার প্রেরিত প্রতিটি পয়সাই তাহাদের হাতে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। নিঃসন্দেহ একথা বলা যাইতে পারে, বর্তমান ভারত নূতন ভারত। এই নূতন ভারতকে সমগ্র বিশ্ব সম্মানের সহিত স্বীকার করিয়াছে।

বর্তমান ভারত সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হইল দেশকে উন্নতির চরমশিখরে লইয়া যাওয়া। ভারত আজ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইয়াছে। অর্থনৈতিক উত্থানের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও একগুচ্ছ কর্মসূচি সমান গুরুত্ব পাইয়াছে। বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের বিশ্বাস যে, ২০২৯ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে। দুঃখের বিষয় হইল, দেশকে অধিকতর উন্নত, অধিকতর শক্তিশালী, দেশের গণতন্ত্রকে অধিকতর মজবুত করিবার লক্ষ্যে যখন ভারত সরকার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন, জিএসটি নীতিতে আরও সংস্কার, সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিল পেশ-সহ নানা উন্নয়নমুখী সংস্কার ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে, তখন দেশের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি তাহার অপপ্রচার করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অদ্যাবধি যাহা যাহা কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। আরও দুঃখের বিষয় হইল, তাহাদের বিরোধিতার প্রকার শত্রুদেশের ভারত-বিরোধিতার অনুরূপ। যেন মনে হইতেছে, দেশের এইপ্রকার উন্নতিতে তাহারা খুশি নহে। দেশবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তিগুলিও ভারতের উন্নতিতে খুশি নহে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া প্রকারান্তরে তাহারা ভারতের বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ ছুড়িয়া দিতেছে। তাহা সত্ত্বেও এইকথা জোরের সহিত বলা যাইতে পারে, বর্তমান ভারত সর্বপ্রকার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে সক্ষম। ভারতের অধিকাংশ রাজ্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদর্শিত পথের শরিক হইয়া রাজ্যবাসীকে সুশাসন প্রদান করিতেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিতে শাসকদলের মদতেই সমস্ত প্রকার অরাষ্ট্রীয় গতিবিধি সক্রিয় হইয়া রাজ্যটিকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গবাসীর আশু কর্তব্য হইল, এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাইয়া এই রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা।

সুভাষিতম্

অভ্যাসাদ্ধার্যতে বিদ্যা কুলং শীলেন ধার্যতে।
গুণেন জ্ঞায়তে ত্বার্যঃ কোপো নেত্রেণ গম্যতে।।

অভ্যাসের দেখে বিদ্যা, চরিত্র দেখে বংশ, গুণ দেখে শ্রেষ্ঠতা এবং চোখ দেখে রাগের অনুমান করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী কেন মানছেন না যে চাইলেই ভোটার বা নাগরিক হওয়া যায় না

শিশুসুলভ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। মমতা ব্যানার্জির অস্বস্তি বাড়িয়ে অক্টোবর থেকেই দেশজুড়ে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হতে চলেছে। মমতা ব্যানার্জি সাতবারের সাংসদ। তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। চারবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অথচ শিশুর মতো মানতে চাইছেন না যে চাইলেই ভারতের নাগরিক বা ভোটার হওয়া যায় না। তার জন্য সাংবিধানিক পদ্ধতি রয়েছে। একটানা ক্ষমতায় থাকলে এক ধরনের রাজনৈতিক বদভ্যাস তৈরি হয় যে সবকিছু মনমতো হতে হবে। নেহরু থেকে মমতার এক ধারা। ক্ষমতায় থাকার শিশুসুলভ লোভ।

সুপ্রিম আদালতের মতে রাজনৈতিক জটিলতা কাটাতে নাগরিকত্ব আর ভোটাধিকার নিয়ে বড়ো ধরনের ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। বিহারে আধার কার্ডের জাল ব্যবসা এখন তুঙ্গে। আদালতের নথি অনুযায়ী অন্তত ১৪০ শতাংশ কার্ড কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিলানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় ভোটার তালিকার সংশোধন অবশ্য প্রয়োজন, বিশেষত পঙ্গপালের মতো রোহিঙ্গা আর অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা যখন এরাজ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। এরাই পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের ভুয়ো আর ভূতুড়ে ভোটব্যাংক। বেআইনি অনুপ্রবেশ ঘিরে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলেও এটা অনস্বীকার্য যে শাসক দলের আশকারা আর মদতেই তারা এই রাজ্যে আশ্রয় পাচ্ছে।

২০০৫ সালে বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রবেশকারী আটকাতে যতটা উদ্যোগী ছিলেন ২০ বছর বাদে ভোটের লোভে তাদের বেআইনি জায়গা করে দিতে ঠিক ততটাই আন্তরিক। উদ্ভট ভাবনাকে রাজনৈতিক ডিঙ্গি বানাতে সিদ্ধহস্ত তিনি। তা ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হোক বা অনুপ্রবেশ সমস্যা। ভুয়ো ও ভূতুড়ে ভোটারদের শায়েস্তা করতেই বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন।

মমতা ব্যানার্জির মতো জ্যোতি বসুও কল্পনা করতেন আমৃত্যু তিনি ক্ষমতায় থাকবেন। অবসর না নেওয়ার আস্ফালন করতেন। ২৩ বছরের মধ্যেই তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের অবসান হয়। জাতীয় নিরাপত্তা বনাম রাজ্যের অধিকারের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই মমতা ব্যানার্জি ভোট জিততে চান। তাই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের সাহায্য নেন। বাংলাদেশ থেকে যত পরিমাণে রোহিঙ্গা আর মুসলমান অনুপ্রবেশকারী এরাজ্যে আসছে, তা নিয়ে কিছু বুদ্ধিজীবী অবান্তর বুদ্ধি ব্যয় করেন। এক্ষেত্রে এক আর একশোর মধ্যে যে ফারাক নেই তা তাঁরা বোঝেন না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনুমান, এরাজ্যে আনুমানিক ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে। এদের না ছেঁটে ২০২৬ সালে ভোট হওয়া বাতুলতা। ভূতুড়ে ভোটার বাঁচিয়ে রেখে ভোট করার অর্থ নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই অবৈধ করে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী নেহরু থেকে মনমোহন সিংহের সময় অবধি নাগরিক বা ভোটার তালিকা নিয়ে সেরকম বড়ো মাপের নাড়াচাড়া হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পর সেখানে সামরিক সাহায্যে মোল্লাবাদী সরকার চালু হয় আশির দশক থেকে। তারপর থেকেই চালু হয় বেআইনি আর অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ। যেমন আফগানিস্তান থেকে কাশ্মীরে, ঠিক তেমন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে।

অনুপ্রবেশের বেশিরভাগটাই জুড়ে ছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস শাসন, ফলে তা আটকানোর চেষ্টা হয়নি। রাজ্যের বাম আমলে অনুপ্রবেশকারীরা ব্যবহৃত হয়েছিল ভোটস্বার্থে। যেমন এখন করছেন মমতা ব্যানার্জি। বিভিন্ন সময় মোট ১৩বার নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন হয়েছে, তখন কিন্তু মমতা ব্যানার্জি তার বিরোধিতা করেননি। ২০১১-তে প্রথমবার জয়ের পর রাজ্যের ভোটে তৃণমূল দু'বার বেমক্কা জিতে যাওয়ায় অনুপ্রবেশ আর ভুয়ো ভোটারের খেসারত গুনতে হচ্ছে রাজ্যের প্রকৃত ভোটারদের।

তৃণমূল সঠিক অর্থে কোনো রাজনৈতিক দল নয়। একটা পারিবারিক গোষ্ঠী। ফলে বিজেপির মতো একটি প্রকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা একটু কঠিন হবে। গত ছয় দশক ধরে কংগ্রেস আর বিদেশি বামেরা রাজ্যটিকে যতটা পিছিয়ে দিয়েছিল, তৃণমূল কেবল সেটাকে ত্বরান্বিত করেছে। নীচের দিকে গড়িয়ে চলা রাজ্যটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন করতেই হবে। এটি একটি সাংবিধানিক পদ্ধতি। বিগত তিন দশকে অনুপ্রবেশ আর অভিবাসনের ঠেলায় ইংল্যান্ডের ব্রিটিশরা এখন লন্ডনের বড়ো শহরগুলি থেকে পালিয়ে গ্রামেগঞ্জে বাস করছেন। ভুয়ো ভোটার আর অনুপ্রবেশ রুখতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গের সেই দশা হবে। কংগ্রেসের নেতারা সব ত্যাগ করলেও পদত্যাগটা করেন না। ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে হয়। মমতা ব্যানার্জি সেই আঁতুড়ের উপজাত।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ফাঁদ পাতছে কেন্দ্র

ফেজ টুপিপ্রেমীষু দিদি,

ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের কেমন সম্পর্ক থাকবে এসব নিয়ে চিন্তা তো প্রধানমন্ত্রীর রয়েছেই। সেইসব নিয়েই থাকতে পারেন। কিন্তু না। তিনি এখন এই রাজ্যের জনবিন্যাস নিয়ে চিন্তিত। এবার তিনি জনবিন্যাস মিশনের ঘোষণা করেও দিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায় আমি যা বুঝলাম, তাতে বাকি পররাষ্ট্র বিষয়ক সমস্যার সমাধান ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু বাংলাদেশ যে ক্ষতি পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে ভারতে করে চলেছে তার জন্য এই রাজ্যটা একদিন হয়তো আজকের মতোও আর থাকবে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কেন্দ্রের। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলোর জনবিন্যাস দ্রুত বদলে যাওয়া, একের পর জেলা মুসলমান প্রধান হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দিদি, দুধেল গাইদের প্রশ্রয় দিয়ে এরাজ্যের বড়ো ক্ষতি হতে পারে কিন্তু ভোটবাক্স তো ভরাতে হবে! সেটাই এখন চিন্তার।

এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কী করতে চাইছেন সে কথা বলে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মতো একই সমস্যায় ভোগা অসমে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন সে কথা। সেখানেই তো তিনি বলেছেন নতুন মিশনের কথা।

অসমে এই বক্তব্যের পরেই কলকাতায় 'যৌথ সেনাপতি সম্মেলন'। উদ্বোধনে হাজির রইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতি দু'বছরে একবার ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধান-সহ অন্য উচ্চপদস্থ কর্তারা এই সম্মেলনে বাহিনীর লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নিয়ে সর্বোচ্চ স্তরের বৈঠক করেন। সেটা এবার কলকাতায় ভারতীয় সেনার পূর্ব কম্যান্ডের সদর দপ্তর বিজয়দুর্গ বা ফোর্ট উইলিয়ামে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সেখানে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল।

এই বৈঠকের সঙ্গে ২০২৬ সালের নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া ঠিক হবে না দিদি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জন-মানচিত্র বদলে যাওয়া নিয়ে দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে এই বৈঠক কি গুরুত্বপূর্ণ নয় দিদি!

তবে দিদি, প্রধানমন্ত্রী যে ডেমোগ্রাফি মিশনের কথা বলেছেন সেটা কিন্তু আচমকা নয়। পুজার পরেই দেশজুড়ে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর। এই প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত হয়ে যাবে কত বিদেশি ভুয়ো পরিচয়ে এই রাজ্যে রয়েছেন। এর পরেই ২০২১ সালে করোনার জন্য না-হওয়া জনগণনার পরিকল্পনা রয়েছে। তার সঙ্গেই মনে হয় প্রধানমন্ত্রী যুক্ত করতে চাইছেন ডেমোগ্রাফি নির্ণয়। এই বদল যে একটা ষড়যন্ত্র তা গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লার বক্তৃতাতেই স্পষ্ট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই যে জনসংখ্যার বদল এবং সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের বাড়বাড়ন্ত কেমন ক্ষতি করছে সেটাও বলেছিলেন তিনি। আর তখনই লালাকেল্লা থেকে মিশনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়েছেন, বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনবিন্যাসগত পরিবর্তন। এরফলে যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি।

এটা নিয়ে ইতিমধ্যেই দিদি আপনার পাশে দাঁড়াতে সেকু, মাকু ও পাকুরা নিন্দা করতে শুরু করেছেন। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে বিশ্বের সব উন্নত দেশই এখন এ বিষয়ে মন দিয়েছে। দেশের মাটি থেকে বিদেশি হঠাও অভিযান বরং ভারত অনেক দেরিতে শুরু করেছে। কংগ্রেস জমানায় যা নিয়ে টুঁ শব্দটি করা হয়নি। জনবিন্যাস মিশন যে হতে চলেছে তার ইঙ্গিত ছিল ২০২৪ সালের নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত ভারত সরকারের অন্তবর্তী বাজেটে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সেখানে জানিয়েছিলেন, বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনবিন্যাসগত পরিবর্তন। এরফলে যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি। উদ্ভূত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য কী পন্থা নেওয়া হবে, ওই কমিটি তা সুপারিশ করবে বলেও বলা ছিল বাজেটে। এবার সেটাই করতে চাইছে কেন্দ্র।

প্রধানমন্ত্রী এরবার যখন বলেছেন, তখন ভয় পাওয়া কিন্তু শুরু হয়ে গেল দিদি। আমি ভাবছি এটা নিয়েও তো আপনাকে বিরোধিতা করতে হবে। কিন্তু কী বলবেন সেই বিরোধিতার সময়ে! আমার বিশ্বাস যে, আপনি ঠিক একটা লাইন বেছে নেবেন। হিন্দুদের ভয় দেখাতে হবে তো! 'বাংলা খতরে মেঁ' বলার নতুন স্লোগান চাই দিদি। জম্পেশ স্লোগান চাই। সময় থাকতেই তৈরি করে রাখুন। □

অতিথি কলম

নরেন্দ্র মোদী

‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর জোরালো সমর্থক মোহনরাও ভাগবত

এগারো সেপ্টেম্বর দিনটি আমাকে দুটি বিপরীত স্মৃতির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় । প্রথমটি ১১৯৩ সালের, যখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রবাদপ্রতিম শিকাগো বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ‘আমেরিকার ভাই ও বোনেরা’ এই সামান্য কটি শব্দের মধ্যে দিয়ে তিনি সভাগৃহে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। ভারতের চিরায়ত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধলে সার্বজননীন সৌভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। আর দ্বিতীয় স্মৃতিটি হলো, ৯/১১-র ভয়াবহ হামলার, যখন সন্ত্রাসবাদ ও মোল্লাবাদের অভিশাপ এই নীতির ওপর আঘাত হেনেছিল।

তবে এই দিনটি সম্পর্কে আর একটি কথাও বলার আছে। আজ এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্মদিন, যিনি বসুধৈব কুটুম্বকমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সমগ্র জীবন সামাজিক উত্থান এবং সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের চেতনাকে শক্তিশালী করতে উৎসর্গ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক ও মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ‘পরমপূজ্য সরসঙ্ঘচালক’ বলে অভিহিত করেন। হ্যাঁ, আমি শ্রী মোহনরাও ভাগবতের কথা বলছি, যাঁর ৭৫তম জন্মদিন ঘটনাচক্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তির সঙ্গে এই একই বছরে পড়েছে। আমি তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই এবং তাঁর সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন প্রার্থনা করি। মোহনজীর পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। মোহনজীর পিতা প্রয়াত মধুকররাও ভাগবতজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার ‘জ্যোতিপুঞ্জ’ বইতে তাঁর সম্পর্কে বিস্তরিতভাবে লিখেছি। আইনি জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গুজরাট জুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে শক্তিশালী করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পালন করেছিলেন। রাষ্ট্র নির্মাণের প্রতি মধুকরজীর আবেগ এতটাই ছিল যে, তা তাঁর পুত্র মোহনরাওয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাঁকে ভারতের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল। এ যেন এক পরশমণি, মধুকররাও থেকে আর এক পরশমণি মোহনরাওয়ে পরিণত হওয়া। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি মোহনরাও প্রচারক হন। এই ‘প্রচারক’ শব্দটি শুনে কেউ ভুল করে ভাবতে পারেন যে, এটি এমন কাউকে বোঝায় যিনি কোনো ভাবধারার প্রচার করছেন। কিন্তু যাঁরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে এই প্রচারক প্রথা সংগঠনের কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

মোহনজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। প্রতিটি কর্তব্যই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। নব্বইয়ের দশকে অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ হিসেবে তাঁর ভূমিকা আজও বহু স্বয়ংসেবক স্মরণ করেন। তার আগে তিনি একটা দীর্ঘ সময় বিহারের গ্রামেগঞ্জে কাজ করেছেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা তৃণমূল স্তরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও নিবিড় করেছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ হন। ২০০০ সালে তিনি সরকার্যবাহ নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রেও তাঁর কাজ করার অনন্য ভঙ্গি এবং জটিল পরিস্থিতিকে সহজে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার দক্ষতা নজর কাড়ে। ২০০৯ সালে তিনি সরসঙ্ঘচালক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সজীবতা ও প্রাণবন্ততার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

সরসঙ্ঘচালকের পদ নিছক সাংগঠনিক দায়িত্বের থেকে অনেক বেশি। আত্মত্যাগ, উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা এবং মা ভারতীর প্রতি অটল অঙ্গীকার নিয়ে অসাধারণ ব্যক্তিসম্পন্ন কার্যকর্তারা এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মোহনজী এই গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে পালন তো করছেনই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজস্ব শক্তি, বৌদ্ধিক গভীরতা এবং অনুপম নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা। এই সবই ‘রাষ্ট্র প্রথম’ ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত।

আমাকে যদি মোহনজীর দুটি গুণের কথা বলতে হয় তাহলে সেই দুটি হলো, ধারাবাহিকতা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সংগঠনকে পরিচালনা করছেন। কিন্তু কখনোই সংগঠনের মূল আদর্শ যা নিয়ে আমরা সবাই গর্বিত, তার সঙ্গে আপোশ করেননি। অথচ একই সঙ্গে তিনি সমাজের বিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে চলেছেন। যুবপ্রজন্মের সঙ্গে তাঁর এক স্বাভাবিক সংযোগ রয়েছে, তাই তিনি সর্বদাই আরও বেশি তরুণ-তরুণীকে সঙ্ঘকাজে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁকে প্রায়ই প্রকাশ্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে এবং মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করতে দেখা যায়। আজকের গতিশীল ও ডিজিটাল বিশ্বে এর প্রভাব অপরিসীম।

সব মিলিয়ে বলতে গেলে, মোহনজীর কার্যকাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ১০০

> **স্বয়ংসেবকরা সকলেই সমর্থ ও সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখেন। এর বাস্তবায়নে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড প্রাথমিক শর্ত। দুটি ইতিবাচক প্রবণতাই মোহনজীর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে।**

বছরের যাত্রার সবচেয়ে রূপান্তরধর্মী পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। গণবেশের পরিবর্তন থেকে শুরু করে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (প্রশিক্ষণ শিবির) প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে তাঁর নেতৃত্বে।

কোভিড মহামারির সময়কালে মোহনজীর উদ্যোগ আমি বিশেষভাবে মনে রাখব। সেই সময়ে মানুষ এমন একটি অতিমারির সম্মুখীন হয়েছেন, যা সারা জীবনে হয়তো একবারই আসে। সেই সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন ছিল। সেই সময় মোহনজী প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর আরও জোর দেন। বিশ্বজুড়ে সংকটের মধ্যেও তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিন্যাসে উদ্যোগী হন। সেই সময়ে নিজের এবং অন্যদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে স্বয়ংসেবকরা প্রত্যেকটি সংকটাপন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেই সময় কঠোর পরিশ্রমী অনেক স্বয়ংসেবককে আমরা হারিয়েছি। কিন্তু মোহনজীর অনুপ্রেরণার কারণে বাকিদের নিষ্ঠায় কোনো ঘাটতি পড়েনি। এবছরের শুরুর দিকে নাগপুরে মহাদেব নেত্র চিকিৎসালয়ের উদ্বোধনের সময়ে আমি বলেছিলাম যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হলো অক্ষয়বটের মতো, যা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সচেতনতাকে পুষ্ট করে। এই অক্ষয়বটের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ তার ভিত্তি হলো মূল্যবোধ। যে নিষ্ঠার সঙ্গে মোহন ভাগবতজী এই মূল্যবোধের প্রসারে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তা সত্যিই অত্যন্ত প্রেরণাদায়ী।

মোহনজীর ব্যক্তিত্বের আরেকটি প্রশংসনীয় দিক হলো তাঁর মার্জিত আচরণ। অন্যের কথা শোনার ব্যতিক্রমী ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। এই বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে।

এখানে আমি বিভিন্ন জন-আন্দোলনের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয়টিও উল্লেখ করতে চাই। 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' থেকে 'বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও'— সব ক্ষেত্রেই তিনি সমগ্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের পূর্ণ উদ্যমে শামিল হতে বলেছেন। সামাজিক কল্যাণের প্রসারে মোহনজী 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর কথা বলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে— সামাজিক সম্প্রীতি, পারিবারিক মূল্যবোধ, পরিবেশগত সচেতনতা. জাতির নিজস্বতা এবং নাগরিক কর্তব্যবোধ। সব ভারতীয় নাগরিকের কাছেই এই বিষয়গুলি প্রেরণাদায়ী। স্বয়ংসেবকরা সকলেই সমর্থ ও সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখেন। এর বাস্তবায়নে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড প্রাথমিক শর্ত। দুটি ইতিবাচক প্রবণতাই মোহনজীর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে।

মোহনজী সর্বদাই 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর জোরালো প্রবক্তা। ভারতের বৈচিত্র্য, প্রথা এবং সাংস্কৃতিক বর্ণময়তার প্রতি তাঁর বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর। ব্যস্ত সময়সূচির বাইরে তিনি সর্বদা সংগীতের মতো কলাক্ষেত্রে বিচরণ করার সময় খুঁজে নেন। খুব কম মানুষই জানেন যে, তিনি বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী। পাঠক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা ফুটে উঠেছে বিভিন্ন ভাষণ ও আলাপচারিতায়।

এবছর আর ক'দিন পরেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ১০০ বছর পূর্ণ হবে। এটি অত্যন্ত আনন্দময় সমাপতন যে, এবছরই বিজয়াদশমী, গান্ধীজয়ন্তী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী জয়ন্তী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন পড়েছে একই দিনে। এই বিষয়টি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষের কাছে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই সময়ে সরসঙ্ঘচালকের আসনে রয়েছেন মোহনজীর মতো একজন প্রাজ্ঞ ও পরিশ্রমী মানুষ।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, মোহনজী বসুধৈব কুটুম্বকম্ মন্ত্রের জীবন্ত প্রতিফলন। তিনি দেখিয়েছেন, যাবতীয় বৈষম্য পেরিয়ে প্রত্যেকটি মানুষকে কীভাবে আপন করে নিতে হয়। এই ইতিবাচক বিষয়টি সমাজে সমতা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক আস্থা নিশ্চিত করে। আরও একবার মা ভারতীর সেবায় উৎসর্গীকৃত মোহনজীর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

(লেখক ভারতের প্রধানমন্ত্রী)

শোক সংবাদ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ড. সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত গত ২৭ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি শ্রীরাম কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বহু বছর স্বস্তিকা পূজা সংখ্যায় উপন্যাস, ছোটো গল্প, বড়ো গল্প লিখেছেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও ১ নাতনিকে রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ পরগনা জেলার সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুর শাখার স্বয়ংসেবক বর্তমানে দিল্লি নিবাসী ড. অপূর্ব মুখোপাধ্যায় গত ২৬ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ভাই-বোন ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়- পরিজনকে রেখে গেছেন।

* * *

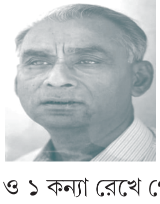

বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সম্মিলনী কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক তারকনাথ দে গত ১৬ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর মালদা জেলার কুশিদা শাখার স্বয়ংসেবক, বর্তমানে মালদা নগরের বাসিন্দা ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী মায়া ভট্টাচার্য্য গত ২৫ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পূজাবকাশের জন্য স্বস্তিকা কার্যালয় ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই কারণেই স্বস্তিকার ৬ ও ১৩ অক্টোবর, ২০২৫, সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হবে না। ২০ অক্টোবর থেকে পুনরায় স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে।

— স্বঃ সঃ

‘ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫’-এ স্থগিতাদেশ না দেওয়া সর্বোচ্চ আদালতের সঠিক সিদ্ধান্ত

‘ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫’-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা একাধিক আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় আইনটিকে খারিজ বা রদ করা ছাড়াও আইনটির ওপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছিল আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে। গোটা আইনটির ওপরে স্থগিতাদেশ দেয়নি প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন মাসিহর বেঞ্চ। গত ৪ এপ্রিল সংসদে আইনটি পাশ হওয়ার পরই আইনটির সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয় একাধিক মামলা। আইনের কয়েকটি ধারার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। ভারতীয় সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার এই আইন ভঙ্গ করছে না বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। ইসলামি আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ এমন সম্পত্তি যা আল্লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এই ধরনের সম্পত্তি বা সম্পত্তি থেকে সংগৃহীত আয় মুসলমানদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা হলো দানের একটা উপায়। কোনো ইসলাম মজহব-অবলম্বী মানুষ বা মুসলমান যদি একবার এই দান করে তবে তার সেই সম্পত্তি স্থায়ীভাবে হয়ে যাবে ওয়াকফ সম্পত্তি। এই সম্পত্তি আর ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে জনহিতকর কাজের জন্য সেই সম্পত্তি ব্যবহার করা যায়। মাদ্রাসা, এতিমখানা, হাসপাতাল, কবরস্থান ইত্যাদি তৈরির উদ্দেশ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কংগ্রেস যখনই হারার সম্ভাবনা দেখে তখনই মুসলমানদের আরও বেশি করে সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা দিয়ে বাকি ভারতীয়দের বিপদে ফেলে। ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীও ঠিক সেটাই করলেন। ১৯৯৫-এর পর ২০১৩-তে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে আরও ক্ষমতা দিয়ে দিল ইউপিএ-২ সরকার। যাকে বলে অতুল ক্ষমতা! কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৯৫ ও ২০১৩-তে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে অসীম ক্ষমতা দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধানের ৩১ ও ৩০০(ক) ধারা লঙ্ঘন করলেও সেই দিন দেশের সর্বোচ্চ আদালত ছিল চুপ। গত ৩ দশক ধরে হিন্দুদের জমিজমা, সম্পত্তি লুঠের সম্পূর্ণ অধিকার মুসলমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওয়াকফ বোর্ডের হাতে দিয়ে দেয় কংগ্রেস। তখন সেই অসাংবিধানিক আইনটিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হলেও আইনটির বৈধতা নির্ধারণের লক্ষ্যে শুনানির ক্ষেত্রে টালবাহানা চলতেই থাকে। কোনো আইন যে উদ্দেশ্যে পাশ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তার প্রয়োগ হয়। এই আইনের ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল এবং রাজ্যগুলির ওয়াকফ বোর্ড সম্মিলিতভাবে হয়ে ওঠে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম জমির মালিক। ৩৮ লক্ষ একর জমির মালিক হয় তারা। এই পরিমাণ জমির ওপর অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির সংখ্যা ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৮৫টি, তার মধ্যে রয়েছে ৩,৫৬,০৩১টি ওয়াকফ এস্টেট। অস্থাবর সম্পত্তির সংখ্যা ১৬,৭১৬টি। জমির মালিকানায় দেশের মধ্যে ভারতীয় রেল প্রথম এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দ্বিতীয়। কিন্তু তারা তো কোনো জমি জোর করে নেয়নি। অর্থের বিনিময়ে অধিগৃহীত হয়েছে সেই জমি। সেই অর্থে ওয়াকফ বোর্ড হলো ভারতের মধ্যে বৃহত্তম জমি-জায়গা কবজা মাফিয়া। অন্যায়ভাবে জমি দখলের জন্য এদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে ৫৮,০০০ অভিযোগ ছাড়াও ওয়াকফ কাউন্সিলে ১২,০০০ অভিযোগ, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে ১৮,৪০০ অভিযোগ এবং বিভিন্ন আদালতে ১৬৫টি মামলা বিনা নিষ্পত্তিতে পড়েছিল।

পৃথিবীতে ইসলামের আবির্ভাবের আগে তৈরি হয় বহু হিন্দু মন্দির। সেগুলিও দখল করা শুরু করে ওয়াকফ বোর্ডগুলি। উৎখাত করতে থাকে হাজার হাজার মানুষকে। দেশজুড়ে শুরু হয় বিবাদ, চরমে ওঠে উত্তেজনা। এই পরিস্থিতিতে সংসদে ‘ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫’ পাশ হয়। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর আনা বিলে উঠে আসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী। বিলটি পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলে ১৯৯৫-এর আইনে থাকা— ‘ওয়াকফ বাই ইউজার’ ধারাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ ‘ব্যবহারকারীর দ্বারা ওয়াকফ’ বা কোনো সম্পত্তি শুধুমাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই সেই সম্পত্তি ওয়াকফ হয়ে যাবে, বা ওয়াকফ বোর্ড তা নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে দাবি করতে পারবে— এই ধারাটির আইনগত স্বীকৃতির পরিসমাপ্তি ঘটে। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে সুপ্রিম কোর্টও। দলিল বা উপযুক্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে যাবতীয় ওয়াকফ সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বলে উল্লেখিত হয়েছে নতুন আইনে। এই ধারাগুলির ওপরে স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়াও নতুন আইন অনুযায়ী পাঁচ বছর ইসলাম পালন না করলে সম্পত্তিদানের অধিকারী হওয়া যাবে না। স্বচ্ছতা আনার জন্য ওয়াকফ সংস্থাগুলিতে অমুসলমানদের সদস্যপদ থাকবে। ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সদস্য সংখ্যা দুই থেকে বাড়িয়ে তিন করা হয়। যেখানে থাকবে জেলা জজ, রাজ্যের একজন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার আধিকারিক এবং একজন ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ। কোনো জমি বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে ওয়াকফের দাবি উঠলে তা সমীক্ষা করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা কম্পিটেন্ট অথরিটি হবেন জেলাশাসক এবং ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণার অধিকার তার থাকবে বলে নতুন আইনে বলা হলেও সুপ্রিম কোর্ট তাদের দেওয়া রায়ে জানিয়েছে যে, এক্ষেত্রে কম্পিটেন্ট অথরিটি হবে সেই রাজ্যের হাইকোর্ট। একটি অনলাইন পোর্টাল চালু করে দেশের সব ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য সেই পোর্টালে আপলোড করার কথাও নতুন আইনে বলা হয়েছে। এমন অনেক সংশোধনী-সহ নতুন ওয়াকফ আইনটি পাশ হতেই, সুপ্রিম কোর্টে চলে যায় মুসলমানরা। সঙ্গ দেয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

ভারতীয় সংবিধানের দু'টি ধারা লঙ্ঘন করে যখন একটি আইন প্রায় ৩০ বছর ধরে চলে এসেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তখন কিন্তু কোনো বিচার হয়নি, সেকুলার দলগুলিরও টনক নড়েনি। তাদের অন্যায় আবদারে সায় না দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকে বহাল রেখে একটি সদর্থক বার্তা দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। □

নেপালে সেই পুরনো শকুনের থাবা বিভাজনের ডলার বাহিনীর তাণ্ডব

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

একদম হুবহু বাংলাদেশ স্টাইল। মিলে যাচ্ছে আন্দোলনের কৌশলও। ঠুনকো অজুহাতে ছাত্রদের ব্যবহার করে, তার সঙ্গে অছাত্রদের যুক্ত করে একতরফা হিংসাত্মক কাজ সংঘটিত করা। বাংলাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলন আর নেপাল সামাজিক মাধ্যমগুলি নিয়ন্ত্রণ করার ইস্যু যাই হোক না কেন লক্ষ্য একটাই সরকারের পতন। সেজন্য টাকা কোনো ব্যাপার নয়। গৌরী সেন ডলার নিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যুদ্ধবাজ ও মিথ্যাবাদী প্রতারক ট্রাম্প আসলে চাইছে ভারতের চারপাশেই অশান্তি তৈরি হোক। বাংলাদেশে তার পোষা প্রাণী ক্ষমতায় বসেই ভারতের সেভেন সিস্টার্স নিয়ে বহু গলাবাজি করার পর সমুদ্রসীমা নিয়েও মেতেছিল কিছুদিন। দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে যখন ব্যর্থ তখন গলাবাজিতে একটু টান পড়েছিল। এখন নেপালে অশান্তিকে ঘেউ ঘেউ করতে দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তানের এখন পেট ফুলে ফেঁপে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। এর মধ্যে নেপালে অশান্তি তাঁদের জন্য সুখকর সংবাদ দিয়েছে। নাটের গুরু হয়ে সুদূর আমেরিকা থেকে গৌরী সেনের মতো টাকা ঢালছেন ট্রাম্প আর এই অঞ্চলে পোষা প্রাণীগুলি ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে শুরু করেছে। অথচ আমেরিকার নিজের ঘরেই অশান্তির আগুন জ্বলছে। সামলাতে পারছে না কিছুই। ভেবেছিল শুল্কের তুরুপে ভারত কুপোকাত হয়ে যাবে। অবশেষে যখন দেখলো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না, তখন বেহায়ার মতো আগ বাড়িয়ে গা ঝেড়ে নিয়ে কথা বলছেন। ভারত সম্পর্কে তার ধারণাহীনতাই এই জন্য দায়ী। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে কী লাভ। খেলতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে চিমটি কেটে আত্মসুখ নেওয়ার মতো অনেকটা।

দক্ষিণ এশিয়ায় হিমালয় পর্বত অধ্যুষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ নেপাল। এর ভৌগোলিক অবস্থান যেমন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রাজনৈতিকভাবে জটিল। ভারতের উত্তরে এবং চীনের দক্ষিণে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র দেশটি বহুদিন ধরেই বড়ো শক্তিগুলোর কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। পর্যটন নির্ভর কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। পর্যটন নির্ভর অর্থনীতির এই দেশটি হিন্দু অধ্যুষিত হলেও বর্তমানে ধর্মান্তরের চক্র সেখানে ক্রিয়াশীল থাকায় হিন্দুদের সংখ্যা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। দেশটিতে রয়েছে হিন্দু সভ্যতার অনেক পুরাকীর্তি। একই সঙ্গে রয়েছে বহু বৌদ্ধ নিদর্শনও। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে খ্রিস্টানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ধর্মান্তরণের কারণে। যে থাবা বারবার নেপালের উপরে এনজিও বা মানবাধিকার কার্যক্রমের আড়ালে, আবার কখনো জাতিগত বিভাজনকে উসকে দিয়ে। প্রতিটিক্ষেত্রে আগ্রাসী দেশগুলির সেই একই কৌশল। তাঁদের থাবা থেকে বাদ যায়নি পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, আফগানিস্তানও।

নেপাল একটি বহু জাতিগোষ্ঠী ও বহু ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর দেশ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা দেশীয় এজেন্সিগুলো স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি উসকে দেয় এবং নানা 'উন্নয়ন প্রকল্প'-এর আড়ালে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য বিশাল অঙ্কের ডলার বিনিয়োগ করে দেশকে অচল ও পরনির্ভর করে তোলে। নেপালের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

বিশেষ করে জনজাতি অধিকার, পাহাড়-ভিত্তিক ও তরাই-ভিত্তিক বিভেদগুলোকে পুঁজি করে বহু আন্তর্জাতিক এজেন্সি বড়ো অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেশটিকে নিজের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণে আনা। নেপালের ভূ-অবস্থানের দিক থেকে একে দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় মধ্যকার একটি সেতুবন্ধন হিসেবে দেখা হয়। চীন নেপালের সমর্থন নিয়ে পাকিস্তানকে স্থলপথে যুক্ত করে যে সব সুযোগ-সুবিধার স্বপ্ন দেখেছিল তা এখন দিবাস্বপ্নে পরিণত হতে চলেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সেই দহরম মহরম এখন আর তেমনটা চোখে পড়ে না। পাকিস্তান যে সুবিধাবাদী এবং বিশ্বাসঘাতকের বংশধর চীন হয়তো সেটা বুঝতে পারছে।

আমেরিকা নেপালে সামাজিক বিনিয়োগের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে সেখানকার সামাজিক সংস্কৃতিকে আগে কবজা করে নিয়ে তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে ঋণগ্রস্ত করেছে। এই অস্বাভাবিক ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় গ্রামের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী নেতাদের সকল শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। তাঁরই অংশ হিসেবে নেপালে চলতি দশকে ধর্মান্তরের

ফঃ ২

ঘটনা ঘটেছে আগের যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি। নেতারা, পরোক্ষভাবে খ্রিস্টান হতে ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। তাই গরিব মানুষের বাধ্য হয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে চলেছে।

অপরদিকে ভারত নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক একতা ও জনসংখ্যাগত ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছে। ভারত অশান্তির বাতাবরণকে ঘৃণা ও বরাবর বর্জন করে থাকে। ইদানীং আমেরিকার সাদা চামড়ার লোকদের নেপালে আগের চাইতে বেশি পরিমাণে যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে। আর এরই ফসল হলো সাম্প্রতিক অশান্তি ও রক্তপাত। সিআইএ এজেন্টরা যে দেশে গেছে সে দেশেই প্রাণের বিনাশ ঘটিয়েছে। রক্ত ঝরিয়েছে বন্যার মতো। আমেরিকা না চীন এই দুই শক্তির টানাপোড়েনের ফলে নেপালের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, যা দেশের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা।

নেপালের বহু বিদেশি এনজিও ও ফান্ডিং সংস্থা কাজ করছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এদের মূল উদ্দেশ্য মানবাধিকার বা দারিদ্র বিমোচনের আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ। এদের দেওয়া আর্থিক অনুদান স্থানীয় সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করছে, ধর্মান্তর কিংবা জনজাতি স্বাধিকারের নামে জাতীয় সংহতির ভিত দুর্বল করছে। এইভাবে বিশাল অঙ্কের 'ডলার' বিদেশ থেকে এসে দেশে বিভ্রান্তি ছড়ায়, রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করে এবং রাজনীতির প্রকৃত প্রতিচ্ছবি বিকৃত করে তোলে।

নেপাল আজ এক নীরব সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। একদিকেল অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি, অন্যদিকে বহিরাগত হস্তক্ষেপ--- এই দুই মিলিয়ে দেশটি একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে হাঁটছে, আজ প্রয়োজন একটি স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্ব যারা বিদেশি চক্রান্তেরল জাল ছিন্ন করে নেপালকে একটি স্থিতিশীল ও মর্যাদাপূর্ণ দেশে পরিণত করতে পারে। তবে বিগত এক-দুই দশকে নেপালে আমেরিকার সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যা এখন অনেকেই 'নতুন উপনিবেশবাদের সূক্ষ্ম রূপ' বলে উল্লেখ করছেন। দলীয় রাজনীতিতে পরোক্ষ হস্তক্ষেপ— বিশেষ করে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সংখ্যালঘু অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইস্যুতে।

সংবিধান প্রণয়ন, সংখ্যালঘু অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে আমেরিকা নেপাল সরকারকে বারবার চাপ প্রয়োগ করছে। নেপালের 'সেকুলার চরিত্র' বজায় রাখার নামে হিন্দু রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে আসছে আমেরিকা।

The Millennium Challenge Corporation (MCC)— এটি একটি আমেরিকা ভিত্তিক তহবিল, যার মাধ্যমে নেপালকে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান দেওয়া হয়। প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও সড়ক পরিকাঠামোকে হাতিয়ার করে তার আড়ালে নেপাল জুড়ে নানা কার্যকলাপে মদত দিচ্ছে। আজকাল নেপালে USAID, The Asia Foundation, National Endowment for Democracy (NED)-র মতো অনেক মার্কিন সংস্থা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এই সংস্থাগুলোর বেশিরভাগ প্রকল্প নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু-সুরক্ষা, পরিবেশ বা দরিদ্র্য-দূরীকরণ নিয়ে কাজ করলেও, এসবের আড়ালে তারা তাদের নির্দিষ্ট মতাদর্শগত অ্যাজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করে চলেছে। সেখানে খ্রিস্টান মিশনারিদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে আমেরিকার তহবিলের কারণে। ফলে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মান্তরের হার বেড়েছে— বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে দারিদ্র্য, চিকিৎসার অভাব ও সামাজিক বঞ্চনা রয়েছে। এ বিষয়ে নেপালিদের সমাজে অসন্তোষ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এছাড়াও নেপালে সরকারি স্তরে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সমাজে বেকারত্বে সমস্যা তীব্র হওয়ায় বহু মানুষ ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যম থেকে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। নেপালের কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সরকার এই অ্যাপগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে সাধারণ মানুষের সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগায় আমেরিকা-স্থিত আন্তর্জাতিক গুপ্ত প্রশাসন বা গ্লোবাল ডিপ স্টেট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নেপাল সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও একাধিক চুক্তি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে। গোর্খা সৈন্যদের ইতিহাসকে কাজে লাগিয়ে, আমেরিকা প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত সহযোগিতা বাড়াতে চায়, যদিও এখনো নেপালে কোনো মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নেই। নেপাল বহু কারণে অশান্ত হয়ে উঠেছে। তবে, যে কারণটি সবার কাছে স্পষ্ট সেটা হলো পশ্চিমি দুনিয়ার পক্ষ থেকে এই অঞ্চলের শান্তি বিনষ্ট করে দিয়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতকে ব্যতিব্যস্ত রাখা। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, আমেরিকা উচিত শিক্ষা পেয়েই এই অঞ্চল হতে লেজ গোটাতে বাধ্য হবে। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

গৃহমন্ত্রীর 'মুণ্ডচ্ছেদ'-এর বার্তা

মহুয়া মৈত্রের পশ্চাতে কাহারা?

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিটি যেন হিমশৈলের ন্যায়। যতখানি তাহার দৃষ্টি ও শ্রুতির গোচরে আসে, আদত ঘটনার তাহা নিতান্ত একাদশ ভাগের এক ভাগ মাত্র, অথচ সেই একটি মাত্র ভাগকে লইয়াই দশ-বিশটি বাংলা সংবাদমাধ্যম ও পঞ্চাশোত্তর ইউটিউব চ্যানেলকে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় নিরন্তর চর্বিতচর্বণে। সে সবের তলদেশে লুক্কায়িত প্রকৃত সংবাদের অবশিষ্ট দশাংশ যাহাতে মানুষের দৃষ্টির গোচরে না আসে, পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া ব্যারনদিগের পক্ষ হইতে সেই বিষয়ক প্রয়াসের বুঝি অন্ত নাই। ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী অমিত শা সম্পর্কে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক কটুভাষ লইয়াও এহেন কৌশলের প্রয়োগ নজরে পড়িতেছে।

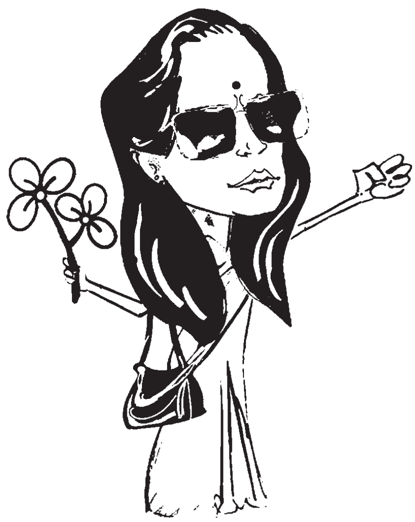

মহুয়া মৈত্র ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী অমিত শা'র মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে রাখিবার প্রেসক্রিপশন করিয়াছেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ রক্ষণাত্মক হইয়া সুকুমার রায়ের কবিতাও পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার 'মুণ্ডচ্ছেদ' মন্তব্যে যাঁহারা ব্যথা পাইয়াছেন তাঁহাদের মগজে ঘিলু নাই— ইহাই তাঁহার কবিতাপাঠের প্রতিপাদ্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সংবাদমাধ্যম এই সকল বিষয়ের প্রচার করিয়াছে বটে কিন্তু এই সংক্রান্ত আদত কথাগুলি বলে নাই।

প্রথমত, ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য যাহার নিকট হইতে আসে তাহার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধ যে প্রবল, তাহা সহজবোধ্য। মহুয়া মৈত্রের ব্যক্তিগত সুরক্ষাবলয়টি নিশ্চিতভাবেই অতি বৃহৎ এবং এমনই পোক্ত যে উহার ভিতর হইতে এই জাতীয় মন্তব্য করিতে তাঁহাকে বোধ হয় অঙ্ক কষিতে হয় না। কারণ তিনি হয়তো-বা আত্মবিশ্বাসী যে তাঁহার কেশাগ্র অবধি স্পর্শ করিবার ক্ষমতা ভারত সরকারের নাই। অথবা বলা যাইতে পারে যে বহু আঁক কষিয়াই বুঝি-বা এই জাতীয় মন্তব্য সাংসদ অনায়াসে করিতে পারেন। কারণ তাহার ফলে তাঁহার নিজ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার ভয় নাই।

এই একই প্রকার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাবোধ রহিয়াছে রাহুল গান্ধীরও। তাঁহাকেও শোনা যায় মহুয়া মৈত্রেরই ন্যায় যে কোনো সময়ে, যে কোনো স্থানে, যে কোনো দেশে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষের নিন্দায় মুখর হইতে অথবা ভারতবর্ষে তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পর্কে যে কোনো প্রকারের কটুভাষে প্রবৃত্ত হইতে। কটুভাষণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শিষ্টতা বা ভারতবর্ষের আইনের সম্ভ্রম রক্ষার আবশ্যকটুকু পর্যন্ত রাহুল গান্ধী অনুভব করেন না। এহেন প্রগাঢ় নিরাপত্তার মহাবেষ্টনীটি মহুয়া মৈত্র বা রাহুল গান্ধীর চতুর্দিকে আঁকিল কে বা কাহারা? তাহারা কি ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? নচেৎ ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রীর মুণ্ডচ্ছেদের কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে বলিতে ভারতবর্ষেরই এক সাংসদের বিবেকবোধ জাগিয়া উঠে না কিংবা কণ্ঠ কাঁপিয়া যায় না কেন?

গত বৎসর অক্টোবর মাসে 'রয়টার্স' লিখিয়াছিল, 'India's interior minister Amit Shah, accused by Canada of being behind plots to target Sikh separatists in that country, has been Prime Minister Narendra Modi's closest aide for decades and is widely seen as his hard-nosed alter ego and potential successor.' অর্থাৎ কানাডার মাটিতে খালিস্তানি জঙ্গির মৃত্যুর দায়ও অমিত শা'র উপর ইতিপূর্বে আরোপ করিয়াছিল পশ্চিমি দেশটি, কিন্তু অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ জোগাইতে পারে নাই। উপরন্তু, ওই পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমটির মতে গৃহমন্ত্রী অমিত শা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরই অপর এক সত্তা (alter ego)। আবার মহুয়া মৈত্রও গৃহমন্ত্রীর কর্তিত মুণ্ড প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে রাখিবার কথাই বলিয়াছেন। এই দুই ভার্সনের মধ্যে যে একখানি সাদৃশ্যের আভাস, পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমের কি তাহা নজরে পড়ে নাই?

উপরন্তু, অমিত শা'র নেতৃত্বে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ সম্বন্ধেও পশ্চিমি দুনিয়ার কিছু নামজাদা সংবাদমাধ্যম করিয়াছিল ভারত সরকার তথা অমিত শা'র কড়া সমালোচনা। 'The Indian government's decision to revoke the semi-autonomous status of Kashmir, accompanied by a huge security clampdown, is dangerous and wrong. Bloodshed is all but certain and tension with Pakistan will soar.'—

লিখিয়াছিল 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্'। এহেন অমিত শা-র মুণ্ড কাটিবার নিদান যদি আসে মহুয়া মৈত্রের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পন্ন কোনো ভারতীয় সাংসদের নিকট হইতে, সেক্ষেত্রে তৎপশ্চাতে পশ্চিমি দুনিয়ার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠা কি স্বাভাবিক নহে?

মহুয়া মৈত্র এবং তৃণমূল-সংশ্লিষ্ট অনেকেরই যে বৈদেশিক খুঁটির জোর থাকা অস্বাভাবিক নহে, তারা অনুমান করা সহজ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এ রাজ্যের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন মেধা পাটেকর, অনুরাধা তলওয়ার, অরুন্ধতী রায় আদি নামিদামি 'আরবান মাওবাদী' অ্যাক্টিভিস্টদিগের সহায়তাপূর্বক, সে সত্যটিকে যেন জোর করিয়া মাটি চাপা দেওয়া হইয়াছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আদি প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত করিবার নিমিত্ত যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, সে অর্থের জোগান আসিয়াছিল কোথা হইতে? শুধুমাত্র চিটফান্ডের চুরির ধনই কি যথেষ্ট হইয়াছিল বৃহৎ সেই আন্দোলনযজ্ঞের রসদের সরবরাহে? নাকি নানা প্রকার ভাতা বাবদ যে বিপুল অর্থের তছরুপ আজও হইয়া চলিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের জনকোষাগার হইতে, তাহার বিশেষ অংশ নিয়মিতরূপে যাইতেছে সেহেন আন্দোলন-পরিচালকদের পকেটে?

কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত কবিবার ঘটনাটি যে আদতে ছিল ভারতবর্ষের বুকে একখানি প্রাদেশিক 'রেজিম চেঞ্জ'-এর ঘটনা, যাহার পশ্চাতে ছিল অ্যাকাডেমিয়া, সংস্কৃতি জগৎ, ব্যুরোক্রেসি, আইন ও অ্যাকটিভিজমের দুনিয়ার সেইসকল ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ, যাঁহারা 'আরবান মাওবাদী' বলিয়া পরিচিত ও কুখ্যাত, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে সামাজিক পরিসরে শুনিতে পাওয়া যায় না কোনো প্রকার বার্তালাপ। এমনকী জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথমভাগে সিপিএমের প্রতাপশালী অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের সমর্থনও পাইয়াছিল সিঙ্গুর আন্দোলন। উপরন্তু, আরবান মাওবাদীরা পশ্চিমি শক্তির মদতপুষ্ট বলিয়া দাবি করিবার স্বপক্ষে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকিলেও সেই সমস্ত বিষয়সকল লইয়া পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমকে মৌন ধারণ করিতেই দেখা যায়। এই বিষয়ক এক আশ্চর্যজনক সমাপতন হইল— লন্ডন হইতে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহুয়া মৈত্রের প্রবেশও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, ২০০৯ সালে রাহুল গান্ধীর বিশ্বস্ত 'আম আদমিরা সিপাহি' রূপে যাহার পর ১০১০ সালে তিনি যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তাঁহার আগমনের সময়কালটি কাকতালীয় হইবার সম্ভাবনা কতখানি?

পশ্চিমবঙ্গ যে আরবান মাওবাদীদিগের শক্ত ঘাঁটি সে সম্পর্কে সাম্প্রতিক অতীতে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশও। তাঁহার অভিযোগ, মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জিলার বিকাশ কার্যে বাধার সৃষ্টি করিতেছে যাহারা, তাহারা মহারাষ্ট্রের কেহ নন, বরং কলকাতায় বসিয়া থাকা আরবান মাওবাদী, যাহাদের নিকট রসদ আসিয়া থাকে বিদেশ হইতে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি-হিমশৈলের নিমজ্জিত অংশ সম্বন্ধে অবহিত যাঁহারা, তাঁহারা বুঝিবেন যে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর এমত অভিযোগ সত্য হইবার সম্ভাবনা প্রায় একশো শতাংশ।

এহেন আরবান মাওবাদীদিগের সক্রিয় সহায়তায় গদিতে বসিবার পর তাঁহাদের নির্দেশ অনুসরণ করিয়াই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চলিতে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী? ফলে পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্ত উন্মুক্ত রাখা এবং তাহার মাধ্যমে ভারতবর্ষের ভূমিতে বহির্দেশের মানুষদের অনুপ্রবেশ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাঁহারা গদিতে বসাইয়াছে সেই আরবার মাওবাদীদিগেরই পরিকল্পনাপ্রসূত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নহে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া চলিবে কীরূপে? আরও সমাপতন হইল— মহুয়া মৈত্র বিধায়ক ও সাংসদ দুই-ই হইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী বিধানসভা ও লোকসভা হইতে ইহা কি ঘটনাক্রমে, নাকি প্রয়োগমূলক ভাবে?

পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়া অবৈধ অনুপ্রবেশ যে বিদেশি শক্তির মতদপুষ্ট এক রাজনৈতিক প্রয়োগ কৌশলই বটে, তাহার স্বপক্ষে প্রতিপোষক তথ্যপ্রমাণ (corroborative evidence) যথেষ্ট রহিয়াছে। তবে সে সকল প্রসঙ্গে না গিয়া বরং একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের বুকে জমিজমা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় ভারতের সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যের ক্ষমতাধীন বিষয়, কেন্দ্রের নহে। যথা : 'Land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation of landlord and tenant and the collection of rents; transfer and alienation of agricultural land; land improvement and agricultural loans; colonization' এবং 'Land revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and reconds of rights, and alienation of revenues' ইত্যাদি হইল ভারতের সংবিধানের স্টেট লিস্টের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। (উপরোক্ত উদ্ধৃতি সংবিধানের স্টেট লিস্ট হইতে)

এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর উপযুক্ত সীমান্তপ্রাচীর গড়িতে হইলে প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা ও অধিগ্রহণ যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই করিতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী? অথচ সেই বিষয়ে ভারতের গৃহমন্ত্রকের অনবরত পত্রসংযোগ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কালেক্টরবাবুরা পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৪৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তকে অদ্যাবধি রাখিয়াছেন উন্মুক্ত, প্রাচীরহীন এবং ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী স্বয়ং পত্রসংযোগ করা সত্ত্বেও জমি অধিগ্রহণের কোনো প্রকার উদ্যোগ তাঁহারা নেন নাই। এ অভিযোগ ভারতের সংসদে দাঁড়াইয়া করিয়াছেন ভারতের গৃহমন্ত্রী স্বয়ং। পশ্চিমবঙ্গের কালেক্টরবাবুদের এহেন সংবিধানবিরোধী ও 'Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013' বিরোধী আচরণের জন্য ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রীকেই দায়ী করা কতখানি সঙ্গত যেখানে ওই আইনের সেকশন 2(1)a'-তে স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে যে জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের পরিবর্তে জমি অধিগ্রহণ করিতে সরকার পারিবে।

অর্থাৎ প্রয়োজনে জাতীয় সুরক্ষার বিষয়টি জলাঞ্জলি দিয়া হইলেও সীমান্তপ্রচীরের জন্য জমি অধিগ্রহণ না করিবার সিদ্ধান্তটি যে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, সে সত্য জানা থাকা সত্ত্বেও যদি অনুপ্রবেশের

দায় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীরই উপর চাপাইয়া দেন কোনো তৃণমূল সাংসদ, তবে তাহা তঞ্চকতাই এবং এহেন তঞ্চকতার কারণ সম্ভবত ইহাই যে সাম্প্রতিক অতীত হইতে শুরু করিয়া ভারতে বসবাসকারী অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করিতে শুরু করিয়াছে ভারত সরকার এবং তাহাতেই বোধ হয় মহাক্রোধান্বিত হইয়াছেন আরবান মাওবাদীরা এবং চাহিতেছেন ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রীর মুণ্ডচ্ছেদ করিতে?

মহুয়া মৈত্রর বক্তব্যটি আদতে বোধ হয় তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামেরও মনের কথা। কারণ পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যানও তিনিই। তিনি আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছেন বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের এদেশের মাটিতে স্থায়িত্ব প্রদান করিতে। রেকর্ড বলিতেছে যে এই সামিরুল ইসলাম হইলেন সিপিআইএম লিবারেশনের সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্যের স্নেহধন্য এবং 'বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ হইতেই তিনি আয়োজন করিয়াছিলেন নাগরিকত্ব আইনের ২০১৯-এর সংশোধনীটির বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়িয়া অসংখ্য প্রতিবাদ আন্দোলন, যে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিল সিপিআইএম-লিবারেশনের ন্যায় রাজ্যের বহু অতিবাম ও বাম দলগুলি যাহার মধ্যে সিপিএমও ছিল। সেই অর্থে বলিতে গেলে সামিরুল ইসলামকে একজন দক্ষ 'আন্দোলনকারী' বলিলে ভুল হয় না এবং সেই সূত্রেই উঠে প্রশ্ন— তাঁহার 'বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ'কে রসদ সরবরাহ করে কে বা কাহারা? (বস্তুত এই প্রবন্ধে লেখিকাই সমাজ মাধ্যমের X-হ্যান্ডলে ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রীর আইডি'কে যুক্ত করিয়া এহেন প্রশ্ন ইতোমধ্যেই তুলিয়াছে)

অতঃপর ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে 'নো ভোট টু বিজেপি' নামক প্রাচাভিযানটি তাঁহারই পরিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া মান্যতা পাইয়াছে এবং নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ জুড়িয়া হিংসার যে তাণ্ডব শুরু হইয়াছিলস সামিরুল ইসলামের জেলা বীরভূম এবং তাঁহার সম্প্রদায় সে হিংসায় করিয়াছিল বিশেষ বিধ্বংসী অংশগ্রহণ। বর্তমান সময়ে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে বাংলাদেশি ও মায়ানমারবাসী রোহিঙ্গাদের হইয়াও প্রবল সংগ্রাম করিতেছেন সামিরুলবাবু এবং সে সংগ্রামে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর ন্যায় পশ্চিমি এনজিও সংস্থাও, যাহাদের রসদের জোগান আসিয়া থাকে জর্জ সোরসের ন্যায় পশ্চিমি ধনকুবেরের সংস্থা হইতে। কিন্তু এহেন সামিরুল ইসলাম নিজেই যদি গৃহমন্ত্রীর মুণ্ডু কাটিয়া প্রধানমন্ত্রী টেবিলে রাখিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তাহার তাৎপর্য বোধ হয় কিছু অন্য প্রকার হইত। তাই কি কথাটি বলানো হইল মৈত্রকে দিয়া? মৈত্রের ভাষাকে সন্ত্রাসবাদের ভাষা বলিয়া মনে হইলেও এতদ্যাবতৎ কেহ তাঁহাকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়ার কথা চিন্তা করে নাই। কিন্তু একই বক্তব্য সামিরুল ইসলাম রাখিলে মানুষের প্রতিক্রিয়া যে অন্য প্রকার হইতে তাহা একপ্রকার নিশ্চিত বলা যায়।

কিন্তু বক্তা যিনিই হউন, এমন তীব্র রাডিকালাইজড্ মনোভাবটিই কি এ রাজ্যের রাজনীতিক্ষেত্রে আদত দুশ্চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত নহে? অনুপ্রবেশ লইয়া ভারত সরকার তৎপর হইয়া উঠিয়াছে এবং অনুপ্রবেশবিরোধী পদক্ষেপ লইতেছে। পশ্চিমি সংস্থা হইতে দান গ্রহণ করিয়া এদেশে অনুপ্রবেশকারীদের দখলদারিত্ব কায়েম করিতে যাহারা চায়, তাহাদের তাহা অপছন্দ হইলেও রাজনীতিক্ষেত্রে অপছন্দ ব্যক্ত করিবার ভাষার প্রয়োগে সংযম অভ্যাসের প্রয়োজন কি নাই? পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকদের তস্করায়ন ঘটিয়াছে বহু পূর্বেই। বর্তমানে তাহাদের মনোভাব ও ভাষার কি উগ্রপন্থায়নও ঘটিতেছে না? অথবা বলা চলে আরবান মাওবাদীদিগের রাজনৈতিক উগ্রপন্থার নকশাটি কি সহসাই অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে না? ভারত সরকারের পক্ষে অনুপ্রবেশকারীদিগকে তাহাদের নিজদেশে 'পুশ ব্যাক' করা হইতেছে বলিয়া মৈত্রের ন্যায় রাজনীতিকরা কি এ রাজ্যের ভূমিতে মুণ্ডচ্ছেদের ন্যায় ঘোর হিংসাকর্মের তথা সন্ত্রাসবাদের স্বাভাবিকীকরণ করিতে চাহেন? এমন সন্দেহের কারণ এই যে পশ্চিমবঙ্গের করিতে চাহেন? এমন সন্দেহের কারণ এই যে পশ্চিমবঙ্গের পুণ্যভূমিতে অতিবাম- উগ্রপন্থার বুননকর্মটি আরবার মাওবাদীদিগের অতি সক্রিয়তায় যে গতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে এ রাজ্যে মানুষের সহিত মানুষের প্রকাশ্য শারীরিক সংঘাত তথা গৃহযুদ্ধ বাঁধানোই তাহার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বস্তুত, এই প্রকার গৃহযুদ্ধের অবতারণা করিবার মাধ্যমে সমাজ-সাংস্কৃতিক ঐক্য, সাম্য ও পারস্পরিক বিশ্বাসকে ধ্বংস করাই আরবান মাওবাদীদিগের কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। তৃণমূলি পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে পারস্পরিক বিশ্বাসের যে অবাব প্রকটভাবে দৃষ্ট হইতেছে, যেরূপ নিরন্তর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ হইতেছে সমাজ, যে প্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইতেছে পরিবারগুলি, যেভাবে ধ্বস্ত হইয়াছে শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থা এবং এমতসকল আপাতবিচ্ছিন্ন বিষয়সমূহের পশ্চাতস্থ বৃহত্তর দানবীয় নকশাটি সম্পর্কে মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিটি যতখানি অস্বচ্ছ, সেই সব দিকে নজর করিলে অনায়াস উপলব্ধি হয় যে আরবান মাওবাদীরা পশ্চিমবঙ্গের বুকে তাঁহাদের তত্ত্বের প্রয়োগে ইতোমধ্যেই বহুলাংশে সফল।

ইতোমধ্যেই ভিন্ন এক রাজনৈতিক দলের বুথ সভাপতি হইবার কারণে এ রাজ্যের এক পিতা নির্মমভাবে নিজ হস্তে হত্যা করিয়াছেন নিজ পুত্রকে। আরবান মাওবাদীদিগের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা তাঁহাদিগের তত্ত্বের এক সফল প্রয়োগ। তাত্ত্বিক ভাষায় বলিতে গেলে মাওইস্ট 'পিপলস্ ওয়ার' ঘটানোই এই সকল কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হয় যে ওয়ার হইবে ভ্রাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, কন্যাঘাতী, পুত্রঘাতী, স্বামীঘাতী, স্ত্রীঘাতী, গুরুঘাতী আদি সকল প্রকার সম্পর্ক ও সম্প্রদায়ঘাতী, যাহা ঠেকাইয়া দেওয়াই অদূর ভবিষ্যতে এ রাজ্যের আদত রাজনৈতিক অগ্নিপরীক্ষা হইতে চলিয়াছে। ভারত সরকারের সক্রিয় সহায়তা ব্যতীত এহেন পরীক্ষায় সফল হইবার সাধ্য পশ্চিমবঙ্গের নাই। মাওবাদকে ২০২৬ সালের মধ্যে নির্মূল করিবার যে লক্ষ্য ভারত সরকার স্থির করিয়াছে, সে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইলে গৃহমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের আরবান মাওবাদীদিগের ঘুঘুর বাসায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবেই হইবে। □

গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত মন্ত্রীদের পদচ্যুতি
একশত ত্রিশতম সংশোধনী বিলের প্রয়োজনীয়তা

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের গণতন্ত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব মানে কেবল প্রশাসনিক পদ নয় বরং নৈতিকতার প্রতীক। জনগণ তাদের ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এই বিশ্বাসে যে নির্বাচিত ব্যক্তি সততা, চরিত্র ও সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করবেন। সেই কারণে মন্ত্রীপদ একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব যা জনগণের কাছে নৈতিক প্রতিশ্রুতির সমান। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে— গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত বা এমনকী হেফাজতে থাকা অবস্থায়ও অনেকে মন্ত্রীপদে বহাল থেকেছেন। এতে প্রশাসনিক শুদ্ধতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আর জনগণের মনে প্রশ্ন উঠেছে— গণতন্ত্র কি কেবল সংখ্যার খেলা?

সংবিধানের ৭৫ নং অনুচ্ছেদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের গঠন ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। ৭৫(১) বলছে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রধানন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিযুক্ত হবেন। ৭৫(২) অনুযায়ী মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি পর্যন্ত বহাল থাকবেন। একইভাবে ১৬৪ নং অনুচ্ছেদ রাজ্য মন্ত্রীপরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২৩৯এএ অনুচ্ছেদ দিল্লির জন্য প্রযোজ্য। এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রী নিযুক্তি ও অপসারণের বিধান থাকলেও, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে থাকলে মন্ত্রী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদ হারাবেন— এমন কোনো বিধান নেই। ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে দুর্নীতি, হত্যা, দাঙ্গা বা অর্থনৈতিক অপরাধে জড়িত ব্যক্তিও ক্ষমতার চেয়ার আঁকড়ে থাকতে পারেন।

এই সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণ করারে উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিল, ২০২৫। এর মূল প্রস্তাব হলো— যদি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা কোনো মন্ত্রী পাঁচবছর বা তার বেশি শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার হন এবং ধারাবাহিকভাবে ৩০ দিন কারাগারে থাকেন, তবে ৩১তম দিনে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদ হারাবেন। এতে নৈতিকতা ও শুদ্ধতার একটি সংবিধানসম্মত কাঠামো তৈরি হবে।

এমন উদ্যোগের আইনি প্রেক্ষাপট আছে। সুপ্রিম কোর্ট Lily Thomas মামলায় (২০১৩) রায় দিয়েছিল— কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি দোষী সাব্যস্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অযোগ্য হবেন। কিন্তু কেবল অভিযুক্ত হলে নয়। মনোজ নারুলা মামলায় (২০১৪) আদালত বলেছিল, অপরাধমূলক অতীত থাকা ব্যক্তিকে মন্ত্রী করা সাংবিধানিক নৈতিকতার পরিপন্থী, কিন্তু এর সমাধান সংসদকেই করতে হবে। Public Interest Foundation-এর দায়ের করা ২০১৯ সালের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন বা মন্ত্রী হওয়া রোধ করা আদালতের ক্ষমতার বাইরে। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো সাংবিধানিক সংশোধনী।

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর সংবিধান সভায় বলেছিলেন, ' আমরা যদি সংবিধানের নৈতিকতা না মানি, তবে সেরা সংবিধানও ব্যর্থ হবে।' ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী সেই নৈকিতকার প্রতিফলন। কারণ জনগণ চান পরিষ্কার ও স্বচ্ছ প্রশাসন, যেখানে অপরাধের ছায়া থাকবে না।

অবশ্য সমালোচনাও আছে। কেউ কেউ বলছেন, কেবলমাত্র অভিযুক্ত হওয়া মানেই তো অপরাধী প্রমাণ হওয়া নয়। সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিককে ন্যায্য বিচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে এই সংশোধনীতে ভারসাম্য রাখা হয়েছে— মাত্র অভিযোগ নয়, বরং টানা ৩০দিন হেফাজতে থাকতে হবে এবং তা গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরফলে খুঁটিনাটি মামলার জন্য নয়. বরং সত্যিই গুরুতর অপরাধে জড়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই বিধান কার্যকর হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এটি কেবল একটি আইনি বিধান নয়, বরং রাজনৈতিক সংস্কারের সূচনা। প্রশ্ন উঠবে, অভিযুক্ত মন্ত্রী মুক্তি পাওয়ার পর দল কি আবার তাঁকে মন্ত্রী করবে, নাকি রাজনৈতিক নৈতিকতাকে অগ্রাধিকার দেবে? এই বিল কার্যকর হলে অন্তত আইনি দিক থেকে স্পষ্ট হবে— অপরাধে অভিযুক্ত অবস্থায় কারাগারে থাকা কোনো মন্ত্রী ক্ষমতার পদে থাকতে পারবেন না।

এ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সময়োপযোগী, সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। বিলটি বর্তমানে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি-র আওতাধীন। আগামীদিনে সংসদের উভয় কক্ষে বিলটি পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে দুর্নীতিমুক্ত দেশ হওয়ার পথে এটি হবে একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি। নতুন ভারত যে পথে এগোতে চাইছে-– স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে-– এই সংশোধনী সেই যাত্রাপথের এক অনিবার্য মাইলফলক।

গণতন্ত্রের আসল শক্তি হলো জনগণের আস্থা। সেই আস্থা রক্ষা করতে হলে অপরাধে অভিযুক্ত মন্ত্রীদের পদচ্যুতি নিশ্চিত করা জরুরি। ভারতীয় সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিল কেবল একটি আইনি প্রস্তাব নয়, বরং আগামী ভারতের নৈতিক দিশার প্রতীক। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হবে— ক্ষমতা মানুষের সেবার জন্য, অপরাধীদের রক্ষার জন্য ন?

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

নির্মলা সীতারমণের জিএসটি-র নতুন রূপরেখা মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিল

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ভারতের অর্থনীতি আজ এক বহুমাত্রিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। এই রূপান্তরের কেন্দ্রে রয়েছে করব্যবস্থার সংস্কার। কর শুধু দেশের আয় নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী— যারা দেশের সর্বাধিক কর্মক্ষম ও ভোক্তা গোষ্ঠী— তাদের উপর করনীতির প্রভাব সর্বাধিক।

২০১৭ সালে GST (Goods and Services Tax) চালু হওয়ার পর থেকে ভারতীয় করব্যবস্থা অনেকটাই সহজ হয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে করহার পুনর্নির্ধারণ, কিছু খাতে ছাড় ও কিছু খাতে বাড়তি নিয়ন্ত্রণ আনা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সাম্প্রতিক বাজেট ও নীতি ঘোষণায় জিএসটি-র একটি নতুন রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন, যা বিশেষত মধ্যবিত্তের জন্য স্বস্তির বার্তা বহন করছে।

নতনি জিএসটি রূপরেখার মূল বৈশিষ্ট্য :

প্রয়োজনীয় পণ্যে করছাড় : অতীতে সাধারণ মানুষের রান্নাঘরের খরচ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ ছিল। নতুন রূপরেখায় খাদ্যশস্য, দুধ, ডিম, শাকসবজি, ওষুধের মতো প্রয়োজনীয় পণ্যে কোনো জিএসটি নেই বা ন্যূনতম রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উপরও করহার কমানো হয়েছে। এর ফলে সাধারণ পরিবার মাসিক খরচে স্বস্তি পাচ্ছে।

গৃহস্থালির সামগ্রীতে স্বস্তি : ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, টিভি, মোবাইলের মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক পণ্যে আগের তুলনায় করহার হ্রাস করা হয়েছে আগে এই পণ্যগুলির লাকসারি হিসেবে গণ্য করে উচ্চ কর বসানো হতো। এখন মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে আনার জন্য ধাপে ধাপে করহার কমানো হয়েছে।

আবাসন খাতে ছাড় : মধ্যবিত্তের বড়ো স্বপ্ন হলো নিজস্ব বাড়ি। নতুন রূপরেখা সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্পে জিএসটি মাত্র ১ শতাংশ এবং সাধারণ আবাসনে ৫ শতাংশ রাখা হয়েছে। এর ফলে ফ্ল্যাট বা বাড়ি কেনার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

পরিষেবা খাতে যুক্তিসঙ্গত কর : রেস্তোরাঁয় খাওয়ার ক্ষেত্রে জিএসটি ৫ শতাংশ রাখা হয়েছে, যা আগের তুলনায় অনেক কম। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও তুলনামূলক স্বস্তি দেওয়া হয়েছে। জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমায় করছাড় পরিবারগুলিকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উৎসাহিত করছে।

ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি : জিএসটি-র একক কাঠামো ব্যবসায়িক জগতে স্বচ্ছতা এনেছে। এর ফলে পণ্যের উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ব্যবসায়ীরা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা পাচ্ছেন, যা শেষ পর্যন্ত পণ্যের দাম কমিয়ে ভোক্তার কাছে পৌঁছাচ্ছে।

মধ্যবিত্তের জন্য স্বস্তির ক্ষেত্র :

১. **রান্নাঘরের স্বস্তি :** প্রতিদিনের বাজার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা মধ্যবিত্তের কাছে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। চাল, ডাল, শাকসবজি, দুধের মতো পণ্যে করছাড় দেওয়ায় তাদের সঞ্চয়ের সুযোগ বেড়েছে।

১. **ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তি ব্যবহার :** আজকের দিনে প্রযুক্তি বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট সাপোর্টেড যন্ত্র, টিভি বা ফ্রিজ মধ্যবিত্ত পরিবারের অপরিহার্য অংশ। কম করের ফলে এসব জিনিস সহজলভ্য হচ্ছে।

৩. **আবাসনের স্বপ্নপূরণ :** বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে করছাড় দেওয়া মধ্যবিত্তকে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করছে। ইএমআই-এর চাপ তুলনামূলকভাবে কমছে, ফলে ব্যয়ভার সামলানো সহজ হচ্ছে।

৪. **রেস্তোরাঁ ও ভ্রমণ খরচ :** নতুন রূপরেখায় রেস্তোরাঁয় খাওয়া ও কিছু ভ্রমণ পরিশেবায় কর কমানো হয়েছে। এতে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

দীর্ঘমেয়াদি সুফল :

১. **সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা :** যখন খরচ কমে, তখন মধ্যবিত্ত সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁকেন। এই সঞ্চয় ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তা তৈরি করে।

২. **বিনিয়োগের সুযোগ :** সঞ্চয়ের টাকা আবাসন, বীমা, শেয়ারবাজার ইত্যাদিতে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে। এর ফলে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসবে।

৩. **উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** মধ্যবিত্ত বেশি কেনাকাটা করলে উৎপাদন বাড়ে, আর উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থানও বাড়ে। নতুন জিএসটি রূপরেখা তাই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরোক্ষ সহায়ক।

৪. **ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসার :** জিএসটি অনলাইন ভিত্তিক করব্যবস্থা হওয়ায় মধ্যবিত্তরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন। এর ফলে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়ছে।

যদিও নতুন রূপরেখা অনেক ক্ষেত্রেই স্বস্তি দিয়েছে, কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়ে গেছে— উচ্চশিক্ষা ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবায় খরচ এখনো বেশি।

ব্যক্তিগত গাড়ি, এয়ার কন্ডিশনার, প্রিমিয়াম ইলেকট্রনিক্সে উচ্চ করহার মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য জিএসটি রিটার্ন ফাইলিঙের ঝক্কি আছে, যা শেষ পর্যন্ত পণ্যের দামে প্রভাব ফেলে। তবে সরকার বারবার আশ্বাস দিয়েছে, ধাপে ধাপে সব সমস্যার সমাধান হবে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের জিএসটি-র নতুন রূপরেখা নিঃসন্দেহে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে স্বস্তি দিয়েছে। প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবায় ছাড়, আবাসন খাতে স্বস্তি, ইলেকট্রনিক্সে করহ্রাস— সব মিলিয়ে মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে।

ভারতের অর্থনীতির প্রাণশক্তি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাদের সুরাহা মানে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতি। ভবিষ্যতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আরও করছাড় এলে সত্যিই বলা যাবে— জিএসটি কাঠামো মধ্যবিত্তের পাশে দাঁড়িয়েছে। □

এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হলো, স্বচ্ছ হলো কি?

বিশ্বপ্রিয় দাস

অনেক প্রহসনের পর ২৬ হাজার বাঙ্গালি শিক্ষকের বলিদান করে, নিজেদের স্বচ্ছতা প্রমাণের জন্য ৯ বছর পর হলো এসএসসি পরীক্ষা। এ যেন ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে নিজেদের স্বচ্ছ প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা করল শাসক দল। কতটা স্বচ্ছ, আর কতটা অস্বচ্ছ সেটা তো ২০১৬ সালের অনেক পরে বোঝা গিয়েছিল। এবার কি সবটাই একেবারে দুধের মতো সাদা হলো? তাতে কি এক ফোঁটাও জল নেই। এই বিশ্বাস অতি বড়ো বিশ্বাসীও বিশ্বাস করবেন না। বেশ কতকগুলি বিষয় নিয়ে খটকা লাগল। যেমন বাঙ্গালি অস্মিতা নিয়ে এত চিৎকার চেঁচামেচি শাসক দলের। এই এসএসসি চাকরির পরীক্ষায় কেন বাইরের পরীক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিয়ে ভুমিপুত্রদের এক অন্য লড়াইতে ঠেলে দেওয়া হলো? কেনই-বা মিডিয়ার সামনে বেছে বেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পরীক্ষার্থীদের মিডিয়ার সামনে হাজির করার কৌশল নেওয়া হলো? কেনই-বা তাঁদের মুখ দিয়ে বলানো হলো যে এই সরকারের আয়োজন একেবারে স্বচ্ছ? এই পরীক্ষায় কি অন্য রাজ্যের পরীক্ষার্থী ছিলেন না?

এই প্রতিবেদক ঝাড়খণ্ডের, বিহারে, ওড়িশার পরীক্ষার্থী দেখতে পেলেও, একেবারে বাছা বাছা উত্তরপ্রদেশের পরীক্ষার্থী দেখতে পায়নি। যদি এই পরীক্ষায় সব রাজ্যের চাকরি প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু এই শাসক দল, তৃণমূল কংগ্রেস, কতটা ভাওতা দিতে পারে, সেই চেষ্টাই করেছে। যদি বলেন কীভাবে? উত্তর প্রদেশ থেকে আসা পরীক্ষার্থী, সবাই একই কথা শোনানো বুলির মতো বলে গেছেন, যোগীর রাজত্বে চাকরির সুযোগ নেই, এই রাজ্যে আছে, তাই তাঁরা এসেছেন, আর পরীক্ষা শেষে তারাই বলছেন, এত নিখুঁত পরীক্ষা ব্যবস্থা, ভাবাই যায় না। ফলে সন্দেহ জাগতেই পারে, এরা ভাড়া করা লোক নয়তো? বলছেন বিরোধী রাজনৈতিক মহল। কেননা, হয়তো সেরকম সুযোগ পায়নি লোক আনার। এতো মানুষ বুঝে নিয়ে বাজারে, চায়ের দোকানে আলোচনা করছে।

আবার এটাও বলছেন, গোপনে হয়তো এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পৌঁছে গেছে পরীক্ষার্থীদের হাতে। ভোটের আগে হয়তো এভাবেই টাকা তোলার অন্য কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। এই কথা বারে বারেই বলছেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আদালতের নির্দেশে এই পরীক্ষা নেওয়া হলো। শাসক দলের কাছে এই পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টা প্রকারন্তরে আশীর্বাদ হয়ে উঠল না তো? বিরোধীরা অভিযোগ এনেছেন দাগি শিক্ষকদের যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে, তাঁর মধ্যে বেশ কয়েকজন পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের কি চিহ্নিত করা গেছে? ১৮০৬ জনের বাইরে আরও অযোগ্য ছিলেন, তাঁদের নাম প্রকাশ করা হলো না কেন? তাহলে কি তাঁদের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হয়েছে, তাঁরা যদি ফেরত চান, অথবা কাকে দিয়েছেন সেটা বলে দেন, তাহলে তো সরকারের অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে।

রাজ্যের শাসক দল কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছে না। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন যে শাসক দল এই কারণেই হয়তো বিশ্বাস করতে পারছে না, কেননা সেই প্রবাদের দিকে লক্ষ্য চলে গেছে হয়তো, 'হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়', যে কোনো সময়, যা কিছু ঘটিয়ে দিতে পারে।

এদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী লালায়িত চিত্তে, দন্ত বিকশিত পূর্বক সাংবাদিকদের জন্য লিখলেন নিজের সামাজিক মাধ্যমে। বললেন, পরীক্ষা স্বচ্ছ ও সফল হয়েছে। 'তিনি কিন্তু পরোক্ষে প্রমাণ করে দিলেন যে এর আগে যত সরকারি চাকরির জন্য পরীক্ষা হয়েছে, সেগুলি অস্বচ্ছ ছিল। তার মানে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করে নিলেন সরকারি চাকরি বিক্রি হয়েছেস, দুর্নীতি হয়েছে। কী যে করেন নাট্যকার, স্ক্রিপ্টটা একটু হলেও কাঁচা হয়ে গেল না!

অন্য প্রসঙ্গ সামান্য একটু ছুয়ে যাওয়া যাক। উত্তরবঙ্গের একটি ঘটনা শুনেছেন কি মুখ্যমন্ত্রী? সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে চাকরি গেছে এক যুবকের। নিশ্চয়ই নানা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আপনারা সবাই দেখেছেন, আপনারা না দেখলেও সাধারণ মানুষ দেখেছেন। খুব বেশি বড়াই করেন বাংলা ভাষা, বাঙ্গালি অস্মিতা নিয়ে। সেখানে অভিষেক নামের এক যুবকের চাকরি গেল বাংলা বলায়, তাকে বাংলাদেশি হিসেবেও চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেনি নিয়োগ কর্তা। ফলে রাজ্যের শাসক দল অন্যের দোষ দেখার আগে নিজেরটা সামলান। শিলিগুড়ির ওই ক্ষত মেরামত করতে হাজির হয়েছিলেন শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেমন প্রতিশ্রুতি দেন, তিনিও দিয়ে এসেছেন, পাশে থাকার। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, এই ঘটনা তো একটা জানা গেল, আরও ঘটনা কি ঘটছে না এই রাজ্যে?

এসএসসি শেষ হলো, এবার সফলদের তালিকাও বেরবে। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের একটি কথা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেটি হলো এই এসএসসি পরীক্ষা না নিলে মুখ্যমন্ত্রী জেলে যেতে হতো। তাঁর হাত থেকে বাঁচলেন তিনি। কিন্তু তারপর? দেখা যাবে আগের ২০১৬ সালের যোগ্য শিক্ষকরা এবার অধিকাংশ সফল হলেন না, তাঁদের অবস্থা কী হবে? হয়তো তাঁরা সিস্টেমের শিকার হবেন। অন্যদিকে যারা সফল হয়ে ইন্টারভিউ-এর ডাক পাবেন, হয়তো এও দেখার সম্ভাবনা আছে, সেই লিস্ট ধরে প্রার্থীদের বাড়িতে চলে গেছেন টাকা তোলার এজেন্টরা। কে বলতে পারে, কী হতে চলেছে? □

আর নয় পিছনের বেঞ্চ

স্কুলে বাচ্চাদের বসার প্যাটার্নটাই বদলে যেতে বসেছে মালয়ালম সিনেমা 'স্থানার্থী শ্রীকুট্টন'-এর হাত ধরে। ছবির শেষ দৃশ্যটি অনেকের মনে গেঁথে গিয়েছে, যেখানে বাচ্চাদের বসার বেঞ্চগুলি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির পরিবর্তে 'ইউ' আকারে সাজানো ছিল। মাঝের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে শিক্ষক মশাই পড়াচ্ছেন। এই দৃশ্যটিই শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিচালক বিনেশ বিশ্বনাথনের এটাই প্রথম ছবি। আর প্রথম ছবিতেই তিনি বাজিমাত করেছেন। ছবির শেষ দৃশ্যের অভিঘাতে কেরালা, তামিলনাড়ুর অনেক স্কুলে বাচ্চাদের বসার বেঞ্চগুলি ইউ-আকারে রাখা হচ্ছে। কেরালার ভালাকম, কন্নুর, আন্দুর, ত্রিশূর, পালাক্কড়ের মতো বেশ কয়েকটি অঞ্চলে এভাবেই ক্লাস করানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মালদহের ইংলিশবাজারে বার্লো গার্লস্ হাইস্কুলও সারিবদ্ধভাবে বসার ধরন পালটে পড়ুয়াদের অর্ধবৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। কেবলমাত্র বসবার আসন বিন্যাসের কারণে কেউ লাস্ট বেঞ্চার বা কেউ ফার্স্ট বেঞ্চার, অথবা কেউ ভালো, কেউ খারাপ— এইরকম লেভেল সেঁটে দেওয়ার জায়গা আর থাকল না; যা শিশুমনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে সকলেই আশা করছেন।

প্রচলিত ক্লাসরুম ব্যবস্থায় পড়ুয়াদের বসার নিয়মটা আদৌ সমত্বসূচক নয়। যার ফলে মাঝের বা পিছনের সারির অনেক পড়ুয়া শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। ফলে পাঠদানের সময় সেইসব পড়ুয়া অমনোযোগী হয়ে পড়ে। পাঠগ্রহণে তারা অসমর্থ হয়ে পড়ে। আর এইভাবে চলতে চলতে একসময় তারা পিছিয়ে পড়া পড়ুয়া হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সর্বোপরি অন্যমনস্ক শিক্ষার্থীরা পাঠদানের সময়ে যেসব অ্যাক্টিভিটিস্‌গুলোয় জড়িয়ে পড়ে, সেসবও শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এর ফলে শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই স্কুলশিক্ষা যথার্থ শিশুকেন্দ্রিক হতে হলে বসার বেঞ্চগুলি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির পরিবর্তে অর্ধবৃত্তাকার সজ্জা হলে সর্বোৎকৃষ্ট হয়।

কিছুদিন আগেও যে ক্লাসরুম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার একটা আভাস পাওয়া যায় সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'লোটাকম্বল' উপন্যাস থেকে। সেখানে গল্প শুরুই হয়েছিল একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকমশাইয়ের প্রচলিত নিয়মে ক্লাস নেওয়ার ধরন দেখিয়ে। 'স্বামী বিবেকানন্দ, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর হুড়হুড় করে একগাদা নাম উচ্চারণ করতে করতে প্রধান শিক্ষক মশাই রবীন্দ্রনাথে এসে স্তব্ধ হয়ে যেতেন। চোখ ছলছলে হয়ে উঠত। তারপর চটাক করে চটকা ভেঙে শেষ বেঞ্চের কোণের দিকে বসে থাকা শম্ভু সাঁতরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলতেন, অ্যায়, উঠে দাঁড়া। শম্ভু কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াত। ইংরেজি কর, রামেরা দুই ভাই।' বলা বাহুল্য, 'রামেরা দুই ভাই'-এর ইংরেজি করতে না পারার জন্যে তৎকালীন সময়ে 'শম্ভু সাঁতরা'দের কপালে কী জুটত তা সহজেই অনুমেয়। ঘটনাটি ব্যাকবেঞ্চারদের প্রতি সহপাঠীদের পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয়দের যে তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে তা বুঝিয়ে দেয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম থাকে। যাতে সকলেই একই পোশাক পরলে তাদের মধ্যে একতা ও সমত্বের বোধ আসে। পঙ্‌ক্তি করে মিড ডে মিল খাওয়ার কারণও একই। জাতপাত, উঁচু-নীচু শ্রেণীতে বিভক্ত নানা ধর্মের এই দেশে, একসঙ্গে খাদ্যগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিশুদের সামাজিক ভেদাভেদ দূরীকরণ সম্ভব হয়। একইরকমভাবে পড়ুয়াদের বসার বেঞ্চগুলি অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো হলে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ করার সুযোগ থাকে। পড়াশোনায় ভালো-খারাপের ভিত্তিতে পড়ুয়াদের বসার শ্রেণীবিভাজন থাকলে শিশুমনে হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়, যা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ভাবনার পরিপন্থী।

তবে সিনেমাটি প্রাথমিক শিক্ষার পুরনো ভাবনারই পুনর্জন্ম দিয়েছে। ১৯৯০ সালের ৫-৯ মার্চ থাইল্যান্ডের জোমতিয়েনে অনুষ্ঠিত হয়— 'দ্য ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন এডুকেশন ফর অল্'। বিশ্বের ১৫৫টি দেশ এবং ১৫০টিরও বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনা রূপায়ণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জেলাস্তরে কার্যকর করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বা 'ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম'। কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশজুড়ে 'প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনীকরণ' -এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পে শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের কথাই বলা হয়েছিল। সেই সময় অনেক স্কুলই বিষয়টি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্কুল চিরাচরিত প্রথাই বজায় রেখেছিল। 'স্থানার্থী শ্রীকুট্টন' সেই ভাবনার সঠিক দিশা দেখিয়েছে।

—অজয় ভট্টাচার্য,
বনগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা।

দুর্গাপূজা উদ্বোধন

জানতে পারলাম এ বছরও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে দুর্গাপূজা। এই উপলক্ষ্যে গত ১০ আগস্ট এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় খুঁটি পূজা। পূজা উদ্যোক্তাদের নিকট আমার বিনীত আবেদন, তাঁরা যেন পূজা উদ্বোধনের জন্য কলকাতার সমস্ত মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের আমন্ত্রণ জানান এবং আরতি দর্শন ও প্রসাদ করতে তাঁদের অনুরোধ জানান। এইভাবে তাঁরা যেন সামাজিক ও জাতিগত ঐক্যের ভিতটা আরও শক্ত ও মজবুত করেন। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। বহুদিন ধরে দেখে আসছি হিন্দু নেতা ও নেত্রীরা (হিজাব পরে) রমজান মাসে ইফতার অনুষ্ঠানে শিক কাবাব খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু কোনো মুসলমান নেতৃত্বকে হিন্দুদের পূজা-পার্বণে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখিনি। অতএব, আশা করব মুসলমান ইমাম, মোয়াজ্জিন, মৌলভি, মৌলানা, উলেমা, মুফতিরা দুর্গাপূজায় আরতিতে অংশগ্রহণ এবং প্রসাদ গ্রহণ করে সামাজিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও

ফঃ ৩

সৌভ্রাতৃত্বের ভিতটা আরও দৃঢ় করবেন।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৭০০০৬৪।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শান্তা দত্তর ভূমিকা প্রশংসনীয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম না জানিয়ে পারছি না। যে কাজটি সাধারণ নিয়মে হওয়ার কথা, সেই কাজটি উপাচার্য মহাশয়া সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন, তার জন্য অবশ্যই তাঁর ধন্যবাদ প্রাপ্য। ঘটনাটা হলো গত ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট-সহ তৃণমূলের শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠন তাঁকে অনুরোধ করে এবং তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে যে, ওই তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করে যেন অন্যদিনে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেন। তাদের এই অন্যায্য দাবিতে তিনি কর্ণপাত না করায় শাসক দলের পক্ষ থেকে তাঁকে রীতিমতো হুমকি দেওয়া চলতে থাকে। অবমাননাকর কথাবার্তা ও কটূক্তি ধেয়ে আসে তাঁর প্রতি। কিন্তু রাজনৈতিক চাপ উপেক্ষা করে উপাচার্য ড. শান্তা দত্ত তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে ওইদিন আইন-সহ বিভিন্ন শাখার সেমেস্টার পরীক্ষা নেন। শান্তিপূর্ণভাবে প্রায় ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষায় বসেন।

অতীতে আমাদের ছাত্রাবস্থায় এমন ঘটনা যে ঘটেনি এমন নয়। আমাদের ছাত্রাবস্থার বেশিরভাগ সময় কেটেছে কংগ্রেসের আমলে। কিন্তু এমনভাবে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার হুমকি বা অনুরোধ কোনোটাই করেনি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন ঘটনা চালু হয়েছে বাম আমলে এবং সেই সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পচন শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত থাকে তৃণমূল আমলে। এই অবক্ষয়ের হাত ধরে শিক্ষাব্যবস্থাকে খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে প্রথমে বামফ্রন্ট এবং পরে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার। আর এনিয়ে রাজ্য সরকার মদতপুষ্ট, তথাকথিত সুশীল সমাজ একেবারে নির্বিকার ও চুপচাপ।

বাম শাসনের শেষ পর্যায়ে এরাই তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছিল। চটিচাটা বুদ্ধিজীবীদের আলোচনার প্রসঙ্গটি যেন মনে করিয়ে দেয় মহাভারতের একটি কাহিনি।

হস্তিনাপুরের রাজসভায় কৌরবপক্ষের দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে চরম অপমান করছে, তখন রাজসভায় উপস্থিত তৎকালীন সব রথী-মহারথীরা নীরব রয়েছেন, অথচ কেউই এগিয়ে আসছেন না দুঃশাসনকে নিরস্ত করতে। কারণ হিসেবে দেখা গেল ওইসব রথী-মহারথী সকলেই কুরুরাজ্যের সিংহাসনের প্রতি দায়বদ্ধ এবং সেই সিংহাসন রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কুরুরাজ্যের রাজধানী হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আসীন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের সকলের অন্নদাতা, এবং এহেন পিতার রাজশক্তিতে বলীয়ান তাঁর পুত্র দুর্যোধন। দুর্যোধনের অভিভাবক-স্থানীয় হয়েও তাঁর বিরোধিতা তাঁরা কীভাবে করবেন? তাই তাঁরা কানে তুলো এবং চোখে ঠুলি পড়ে বসেছিলেন অন্যায় হচ্ছে দেখে ও জেনেও। মহাভারতের এই ঘটনার সঙ্গে একশো শতাংশ মিলে যাচ্ছে আজকের ঘটনাবলী। আজকের চটিচাটা বুদ্ধিজীবীরা যেন মহাভারতের সেই রথী-মহারথীদের প্রতিভূ!

শেষে শুধু বলব যে, ড. শান্তা দত্তর এই অসমসাহসিকতার সঙ্গে তুলনীয় হলো স্বামীজীর বানরের তাড়া খাওয়ার ঘটনা। বানররা তাঁকে তাড়া করলে সদর্পে স্বামীজী ঘুরে দাঁড়াতেই বানরগুলি চম্পট দেয়। স্বামীজীর সেদিনের ভূমিকা থেকে প্রেরণা লাভ করে গত ২৮ আগস্টের এই ঘটনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এমন একটি মূর্তি ধারণ করলেন, যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে ঘৃণ্য জীবেরা পিছুটান দিল। আসলে অন্যায় যারা করে, তাদের মেরুদণ্ড কখনও সোজা থাকে না। উপাচার্য ড. শান্তা দত্তর দৃঢ়চেতা মনোভাবের দরুন শিক্ষক ও ছাত্র পরিচয়ধারী একদল সমাজবিরোধীদের পিঠটান দেওয়া হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী

বনগাঁ মহকুমায় পিএফ অফিস ও ইএসআই হাসপাতালের দাবি

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বনগাঁ মহকুমার একটি বড়ো অংশই অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জীবিকার তাগিদে কেউ স্থানীয় স্তরে কাজ করেন, আবার কেউ কলকাতার পথে পাড়ি দেন। এদের মধ্যে বহু শ্রমিক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) এবং ইএসআই প্রকল্পের আওতায় থাকলেও, বাস্তবে সেই সুবিধা গ্রহণ করতে গিয়ে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, পিএফ সংক্রান্ত কোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে সল্টলেকের করুণাময়ী অফিসে যেতে হয়। অপরদিকে, চিকিৎসা বা ওষুধপত্রের জন্য তাঁদের বারাসাত পর্যন্ত প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়। যদি কোনো শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তবে সবচেয়ে কাছাকাছি ইএসআই হাসপাতাল মানিকতলা বা রাজাবাজারে অবস্থিত। এর ফলে শ্রমিকদের সময়, অর্থ ও শ্রম নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি শারীরিক ক্লান্তিও বাড়ছে। শ্রমিক সংগঠন এবং স্থানীয় মানুষের দাবি হলো, বনগাঁ মহকুমায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের একটি অফিস এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ইএসআই হাসপাতাল অবিলম্বে চালু করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, বনগাঁ মহকুমার বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ প্রতিদিন এই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। যদি কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নেয়, তাহলে অসংগঠিত শ্রমিকরা সরাসরি উপকৃত হবেন এবং প্রকৃত অর্থে শ্রমিক কল্যাণমুখী দেশ গড়ার ভাবনা সফল হবে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, কেন্দ্রের শ্রমিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি কেবল কাগজে নয়, বাস্তবে কার্যকর করতে হলে জেলা ও মহকুমা স্তরে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বনগাঁ মহকুমায় নতুন পিএফ অফিস এবং ইএসআই হাসপাতাল স্থাপন তাই এখন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।।

ভারতীয় নারী ও আধ্যাত্মিক চেতনা

অরুণা রায় চৌধুরী

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তিগুলির মধ্যে অন্যতম হলো অধ্যাত্ম। প্রাচীন যুগে নারীরা কেবল গৃহস্থালির ভারসাম্য রক্ষাকারী ছিলেন না, তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনারও সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রার মতো বিদুষী নারীরা অধ্যাত্ম আলোচনায় গভীর ভূমিকা রেখেছেন। পরবর্তীকালে মীরাবাঈ, মা সারদামণি, আনন্দময়ী মা তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও জীবনযাপন দ্বারা সমাজকে এক বিশেষ দিশা দেখিয়েছেন। কিন্তু আজকের ভারতীয় নারীরা কি সেই আধ্যাত্মিক চেতনার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারছেন?

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, আধুনিকীকরণ, নগরায়ণ ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবন ভারতীয় নারীর মূল্যবোধে পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি তাঁরা ক্রমশ ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এর ফলে আধাত্মিকতা আজ অনেকের কাছে প্রথাগত রীতি বা অনুষ্ঠানিক পূজার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। পরিবারে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ একসময় মা, দিদিমা'রা

তৈরি করতেন— তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালানো, সন্ধ্যারতির সময় ভজন গাওয়া— আজকের শহুরে জীবনে তা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। তবে এর বিপরীত যুক্তিও আছে। অনক গবেষণা বলছে, ভারতীয় নারী অধ্যাত্মকে পুরোপুরি ভুলে যাননি; বরং তাঁরা এটিকে নতুনভাবে প্রয়োগ করছেন। অনেকে যোগ, ধ্যান বা 'মাইন্ডফুলনেস'-এর মতো আধুনিক আধ্যাত্মিক চর্চায় যুক্ত হয়েছে। এই প্রবণতা প্রমাণ করে যে আধ্যাত্মিকতা নারীর কাছে আর কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং মানসিক সুস্থতা ও আত্মোন্নতির উপায়ে পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ সমাজে আধ্যাত্মিকতা এখনো দৃঢ়ভাবে টিকে আছে, যেখানে নারীরাই এর মূল ধারক।

তাই বলা যায়, ভারতীয় নারীরা আধ্যাত্মিক চেতনা পুরোপুরি ভুলে যাননি, বরং তার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নতুন আকার নিয়েছে। প্রথাগত অনুষ্ঠান ও পূজার ধরন কমলেও ব্যক্তিগত ধ্যান, যোগ বা আধ্যাত্মিক সংগঠনে অংশগ্রহণ বেড়েছে। একদিকে ভোগবাদ ও প্রতিযোগিতার চাপে আধ্যাত্মিক চর্চা ক্ষীণ হচ্ছে, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের নারী নিজের মানসিক শক্তি ও সামাজিক অবস্থান গড়তে অধ্যাত্মকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করছেন। ব্রহ্মকুমারী (নারী-ভিত্তিক আধ্যাত্মিক সংগঠন)-এর বিস্ময়ে পড়াশোনা করে জানা গেছে, সেখানে নারীরা আধ্যাত্মিক প্রসারে শক্তভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মাতা অমৃতানন্দময়ীর (আম্মা) মতো আধ্যাত্মিক নেত্রীর মাধ্যমে নারী-নেতৃত্ব লাভ করছে ক্রমশ জনপ্রিয়তা এতে প্রমাণ হয় যে, 'আধ্যাত্মিকতা ও আধুনিকতা পরস্পরের পরিপূরক'। সাধ্বী ভগবতী সরস্বতী যিনি স্ট্যানফোর্ড থেকে শিক্ষিত, তিনি আধ্যাত্মিক বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

Association of Theologically Trained Women of India (ATTWI)-এর মতো সংস্থা নারীর আধ্যাত্মিক দক্ষতা ও theological empowerment-এ কাজ করে; সংস্থাটি স্পষ্টভাবে আধ্যাত্মিকতাহীনতার বিরুদ্ধে প্রচার করছে। সুতরাং গবেষণার নিরিখে বলা যায়, আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় নারীর জীবনে হারিয়ে যায়নি, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপান্তর ঘটছে। তাই একে 'ভুলে যাওয়া' না বলে বরং 'পুনর্নির্মাণ' বলা বেশি যুক্তিযুক্ত।

তাই দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় নারীর আধ্যাত্মিক চেতনা হারিয়ে যায়নি, শুধু বিবর্তিত হয়েছে। □

পুরুষের বন্ধ্যাত্ব লুকোনোর বিষয় নয়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বন্ধ্যা শব্দটি নারীর সঙ্গে খুব সহজেই জুড়ে দেওয়া হয়। অথচ বন্ধ্যাত্বের সমস্যা পুরুষেরাও হতে পারে। পুরুষের বন্ধ্যাত্ম একটি অসুখ। নিয়মিত চিকিৎসাতেই সারে তা।

কখন বন্ধ্যাত্ব চিহ্নিত করা হয়?

এক বছর ধরে স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যদি সন্তানধারণ সম্ভব না হয়, তবেই বলা যায় বন্ধ্যাত্ব। ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অসুস্থতা, ২০-৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে দু'জনের অসুস্থতাই বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষের স্বাভাবিক প্রজনন মূলত দুটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। সুস্থ ও স্বাভাবিক শুক্রাণুর উৎপাদন এবং শুক্রাণুর উৎপাদন এবং শুক্রাণুর নির্গমন (ইজ্যাকুলেশন) যাতে তা নারীদেহের ডিম্বানুর সঙ্গে নিষিক্ত হতে পারে। যদি শুক্রাণুর মান কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় অথবা শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু নির্গমনের পথ সুগম না হয়, তখন বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে।

কী কী কারণে দেখা দিতে পারে বন্ধ্যাত্বের সমস্যা?

অনেক সময়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষমতাও বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে। চিকিৎসকের পরিভাষায় একে বলে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন। এছাড়া থাকতে পারে ইরেক্টাইল ডিসফাংশন-এর জন্য যৌনতা ও যৌনজীবন সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

● **অসুখ ও সংগ্রমণে :** মূলত মাম্পস বা ওই জাতীয় সংক্রামক জ্বরের ফলে যদি শুক্রাশয় ফুলে যায় সেখান থেকে শুক্রাণুর ক্ষতি হয়। এর পাশাপাশি শুক্রাশয়ের যক্ষা হলে ভাস ডেফারেনস (শুক্রনালি দিয়ে শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু নির্গত হয়) রুদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ডায়াবিটিস, ক্যানসার ইত্যাদি কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবে দেহের অ্যান্টিবডি শুক্রাণুকে বিনষ্ট করে। শুক্রাণুর সংক্রমণ হলে তাঁর নড়াচড়ার ক্ষমতা লোপ পায়। ফলে বন্ধ্যাত্ব অবধারিত।

● **হরমোনের সমস্যায় :** মূলত মস্তিষ্কের পিটুইটারি হাইপোখথ্যালামাস গোনাগল অ্যাক্সিসে সমস্যার কারণে পুরুষ প্রজননের হরমোনগুলি যথাযথ ভাবে নিঃসৃত হয় না। সেখান থেকে শুক্রাণু উৎপাদন ও নিষেকের বিষয়ে সমস্যা আসতে পারে।

● **জিনগত সমস্যায় :** জিনগত সমস্যা পুরুষ বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণ। এই সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে ক্লাইনেফেল্টার সিনড্রোম (যাতে ছেলেরা একটি অতিরিক্ত এক্স ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মায়)। সিস্টিক ফাইব্রোসিসের সমস্যায় অ্যাস্পার্মিয়া দেখা যায়। অনেক সময় শুক্রনালি তৈরিই হয় না, একে বলা হয় কনজেনিটাল অ্যাবসেন্স অব ভাস ডেফারেনস।

● **জন্মগত কারণে :** অনেকেরই শুক্রাশয়ের গঠন ঠিক হয় না। তলপেট থেকে নীচের দিকে পুরোপুরি ভাবে গঠিত হয় না সেটি। এটিকে বলা হয় আনডিসেন্ডেড টেস্টিকুলার। পরে সেই শুক্রাশয় থেকে ক্যানসার ও বন্ধ্যাত্ব নানা সমস্যা আসতে পারে। সুতরাং পুত্রসন্তানের জন্মের মায়েদের অবশ্যই ছেলেদের শুক্রাশয় পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

● **অস্ত্রোপচার ও আঘাতে :** কিছু ক্ষেত্রে অস্ত্রোপ্রচারের সময় শুক্রনালিতে আঘাত লাগতে পারে। বিশেষত হার্নিয়া বা ওই জাতীয় অস্ত্রোপচারের সময়ে। এছাড়া কোনো আঘাত লাগলে সেখান থেকেও সমস্যা দেখা যায়।

একটি বিশেষ সমস্যার নাম টরশন অব টেস্টিবল'। শুক্রাশয় নিলম্বিত অবস্থায় তাকে, অনেক সময়ে আঘাতের কারণে সেটি সম্পূর্ণ ঘুরে যায় (টুইস্টেড)। এর ফলে অসম্ভব যন্ত্রণা হয়, শুক্রাশয় ফুলে যায়। অস্ত্রোপচার ছাড়া এর চিকিৎসা নেই। শুক্রাশয়কে আবৃত করে রাখা স্ক্রোটামের শিরা উপশিরা ফুলে গেলে হয় ভেরিকোসেল। এটি অনেকটা পায়ের ভেরিকোজ ভেন অসুখটির মতো।

● **ওষুধ ও পেশাগত কারণে :** শরীরচর্চার জন্য বেশি মাত্রায় স্টেরয়েড ব্যবহার করলে, অতিরিক্ত অ্যান্টি-ডিপ্রেস্যান্ট ও অ্যান্টি-সাইকোটিক ওষুধ খেলেও বন্ধ্যাত্বের সমস্যা আসে। এছাড়াও অতিরিক্ত তাপ ও রেডিয়েশনের সামনে থাগকলে, মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান করলে, কর্মক্ষেত্রে বা জীবনে ভীষণভাবে চাপের মধ্যে থাকলেও বন্ধ্যাত্বের সমস্যা দেখা যায়। শুক্রাণুর সমস্যা হলে চিকিৎসা শুরুর পর তা কার্যকর হতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। ন্যূনতম ২ কোটি শুক্রাণু না থাকলে সন্তান উৎপাদনে সমস্যা হতে পারে।

● **অ্যাস্পার্মিয়া :** ফাইবোরসিসের সমস্যায় অ্যাস্পার্মিয়া দেখা যায়। এতে পুরুষের অর্গাজম হলেও তা থেকে কোনো বীর্য (সিমেন) নির্গত হয় না।

● **হাইপোস্পার্মিয়া :** এতে স্বাভাবিক ১.৫ মিলিলিটারের থেকে কম বীর্য নির্গত হয়।

● **অ্যাজুস্পার্মিয়া :** বীর্যে একেবারেই শুক্রাণু থাকে না। ক্যানসার, জিনগত অসুখ, হরমোনজনিত, যৌন রোগ ইত্যাদির কারণে এই সমস্যা দেখা যায়।

● **অলিগোজুস্পার্মিয়া :** বীর্যে শুক্রাণুর আকার, গতি অন্যরকম হয়। পরিমাণও খুব কম থাকে। মূলত সংক্রমণ, ভেরিকোসেল ভেন, হরমোনজনিত কারণে এই সমস্যা দেখা যায়।

● **অ্যাসথেনোজুস্পার্মিয়া :** বীর্যের মধ্যে বিপুল পরিমাণ শুক্রাণুর গতি অস্বাভাবিক হয়। কখনো একেবারেই কোনো গতি থাকে না। এর সঙ্গে শুক্রাণু নষ্ট হতে থাকে।

● **অলিগোঅ্যাসথেনোজুস্পার্মিয়া :** বীর্যের মধ্যে শুক্রাণুর আকার, গতি ও গড়ন অস্বাভাবিক থাকে। শুক্রাণুর কাউন্ট স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম হয়।

● **নেক্রোজুস্পার্মিয়া :** বীর্যে বেশিরভাগ শুক্রাণু মৃত অবস্থায় থাকে।

চিকিৎসা : রোগ নির্ণয়ে প্রয়োজন সিমেন ও ব্লাড টেস্ট, আলট্রাসাউন্ড ও প্রয়োজনে টেস্টিকুলার বায়প্সি। চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচার ছাড়াও রয়েছে ইন্ট্র-ইউরেটাইন ইনসেমিশন, ডোনার ইনসেমিনেশন, ইন্ট্রা-সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইঞ্জেকশন, টেস্টিকুলার স্পার্ম অ্যাসপিরেশন। কোনটি প্রয়োজন তা চিকিৎসক বলবেন। বন্ধ্যাত্ব একটি অসুখ, তা না লুকিয়ে এর চিকিৎসা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসু। □

সারদা শিশুতীর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

গত ৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনীস্থিত সারদা শিশুতার্থ বিদ্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ সমাপন পর্বে বিকেল ৪টেয় অনুষ্ঠিত হলো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাকেশ কুমার মণ্ডল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, স্বামী জীবনানন্দ মহারাজ, শিশুতীর্থের সম্পাদক প্রদীপ সাহা, বিমলকৃষ্ণ দাস প্রমুখ। এছাড়াও বিদ্যাভারতীর অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আচার্য- আচার্যারা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। আচার্য-আচার্যাদের সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান এগিয়ে চলে। সম্মাননীয় অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কীভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে, প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা কীভাবে আমরা এগিয়ে যাবো, বিগত ৫০ বছর ধরে এই বিদ্যালয় কীভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করবে। স্বামী জীবনানন্দ মহারাজের করকমলে বিদ্যালয়ের স্মরণিকা উন্মোচিত হয়। এই স্মরণিকায় বিদ্যালয়ের ৫০ বছরের নানা তথ্য, গুণীজনদের কথা এবং প্রাক্তন বিদ্যার্থী, আচার্য-আচার্যাদের তুলে ধরা হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে পশ্চিম কলকাতা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী এবং পরিষদের ৬১ তম স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন সমাজসেবী হরিশঙ্কর ঝাঁওর। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তক অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, হরিদ্বারের দণ্ডীস্বামী ব্রহ্মাশ্রম মহারাজ, মার্গদর্শক মহাবীর বজাজ, পরিষদের পশ্চিম কলকাতার অধ্যক্ষ মহেন্দ্র কুমার শর্মা এবং দহমী মাতা মন্দিরের ট্রাস্টি বজরং লাল গোয়েল।

গণেশ বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। ভজন কীর্তন পরিবেশন করেন নিউটাউনের দহমী মাতা মন্দিরের কার্যকর্তারা। এরপর মহাআরতির পর উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সহকার ভারতীর উদ্যোগে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

সহকার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার সন্নিকটে শঙ্কর নেত্রালয় পরিসরে রক্তদান, চক্ষু দান, অঙ্গদান এবং সারভাইক্যাল ক্যানসার সংক্রান্ত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ললিত টোডি। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন সহকার ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্র এবং কমান্ড হসপিটালের ব্লাড ব্যাংক এবং এজেডএএমই-র আধিকারিকরা। স্বাগত ভাষণ দেন সহকার ভারতীর রাজ্য সভাপতি ড. প্রীতিরঞ্জন মাইতি। তিনি প্রথম রক্ত দান করে কর্মসূচির সূচনা করেন। ৬১ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা রক্ত দান করেন। কমান্ড হসপিটাল ব্লাড ব্যাংকের সেনা চিকিৎসকরা রক্তদান শিবির পরিচালনা করেন। মরণোত্তর চক্ষু দান এবং মরণোত্তর অঙ্গ ও টিস্যু দান অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করে শঙ্কর নেত্রালয় আই ব্যাংক এবং রিজিওনাল অর্গান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লানটেশন অর্গানাইজেশন। সারভাইকাল ক্যানসার প্রতিরোধ ভ্যাকসিনেশনের প্রচার করেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। শিবির পরিচালনা করেন সংগঠনের পক্ষে সুপর্ণা দাস ফৌজদার, রতন প্রমাণিক, রাজা চট্টরাজ, সত্যবান পাত্র, তনুশ্রী ঘোষ, হরিশ দে, সঞ্জয় পাল ও অশোক কয়াল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহকার ভারতীর অন্যতম সংগঠক অর্ঘ্য দত্ত।

মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে দধীচি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ১ সেপ্টেম্বর কলকাতার মানিকতলা স্থিত মহর্ষি দধীচি ভবনে মহর্ষি দধীচি জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। প্রথমেই মহর্ষি দধীচি এবং মাতেশ্বরী দধিমথীর পূজার্চনা সম্পন্ন করেন উপস্থিত মাতৃমণ্ডলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিল্পপতি জয়নারায়ণ দায়মা। মুখ্য অতিথি রূপে ছিলেন পারীক সভার অধ্যক্ষ এবং সুপ্রসিদ্ধ সমাজসেবী প্রভুদয়াল পারীক। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন পুরপিতা বিজয় ওঝা এবং রাজস্থান ব্রাহ্মণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষা শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ঊষা আসোপা। ট্রাস্টের অধ্যক্ষ প্রদীপ সুন্টওয়াল মঞ্চাসীন অতিথিগণকে স্বাগত জানান। পরে সকলকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন সর্বশ্রী সীতারাম তিওয়াড়ী, হরীশ আসোপা, বিমল দোলাওত, শ্রীমতা অনুরমা আসোপা এবং শ্রীমতী মঞ্জু দোলাওত।

অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি প্রভুদয়াল পারীক মানবতা রক্ষার জন্য ঋষি দধীচির আত্মত্যাগের বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিশিষ্ট অতিথি বিজয় ওঝা দেশ-বিদেশে দধীচি জয়ন্তী উদ্‌যাপনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। ডাঃ ঊষা আসোপা তাঁর নিজের বাড়িতে চলা হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে মানুষের সেবার বিষয়ে উল্লেখ করেন। শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস নতুন প্রজন্মকে মহর্ষি দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনি বলার জন্য সময়ে সময়ে এরকম অনুষ্ঠান আয়োজন করার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অনুপমা আসোপা ও পিঙ্কীদেবীর পরিচালনায় মাতৃমণ্ডলী দ্বারা মঙ্গলপাঠ এবং ছোটোদের জন্য বসে আঁকো, নিবন্ধ লেখা , মেহন্দী রচনা এবং এবং আরতি থালা সজ্জা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এক ফাঁকে বনিশা আসোপা ও মানবী আসোপা দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করেন। বিজয়ীদের রুপোর মেডেল ও শংসাপত্র প্রাদান করা হয়। অনুষ্ঠানে পূজার ব্যবস্থা মহাবীর প্রসাদ ভামড়া পরিবারের সদস্যরা করেন।

সূর্যসেন কলোনী সারদা শিশুতীর্থের সুবর্ণ জয়ন্তী সমাপন অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনী সারদা শিশুতীর্থের সুবর্ণ জয়ন্তী সমাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গত ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় এক সুসজ্জিত শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় শিক্ষার্থী, আচার্য-আচার্যা এবং বিদ্যাভারতীর অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রা ইন্দিরা মেমোরিয়াল অর্গানাইজেশন (টিকিয়াপাড়া) প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্ররিক্রমা করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল ছাত্রদের ঘোষবাহিনী এবং ছাত্রীদের ঝাঁসির রানিবাহিনী। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথির আসন অলংকৃত করেন দেবব্রত মিত্র। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সহ সম্পাদক নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক প্রদীপ কুমার সাহা এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রধান আচার্য বিমলকৃষ্ণ দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন, পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন এবং মাতৃবন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতিথি বরণ ও পরিচয় করান প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস। বিশিষ্ট অতিথিদের স্মৃতিচারণায় বিদ্যালয়ের ৫০ বছরের নানন সুন্দর সুন্দর মুহূর্তের কথা উঠে আসে। বিদ্যাভারতী নিয়ন্ত্রিত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা পরিবেশন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে উপহারস্বরূপ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ স্মরণিকা তুলে দেওয়া হয়। শেষে কল্যাণমন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে হিন্দি দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সামাজিক সংস্থা শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে হিন্দি দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক ড. বসুমতী ডাগা। মঞ্চাসীন অতিথিগণকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন প্রফেসর দিব্যা প্রসাদ এবং রমাকান্ত সিনহা। শ্রীমতী রীমা পাণ্ডের কণ্ঠে সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ। সভানেত্রীর ভাষণে ড. ডাগা বলেন, বিবিধতার মধ্যে ঐক্যের বার্তা শুধু ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিকতার মধ্যেই নেই, হিন্দি ভাষাও তার দাবি করতে পারে। এই শতাব্দীর বড়ো চ্যালেঞ্জ ভাষা ও বিশ্বায়ন এই চ্যালেঞ্জকে আরও প্রভাবী করে তুলেছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বিশ্ববাজার শুধু হিন্দিভাষাকে নয়, সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে প্রভাবিত করছে। তা সত্ত্বেও হিন্দিভাষা দেশের ভাবাত্মক সূত্রতা, সাংস্কৃতিক একতা এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে একসূত্রে বেঁধে রাখতে সক্ষম। অনুষ্ঠানের ফাঁকে এক গীতিআলেখ্য পরিবেশন করেন নন্দলাল রোশন, রীমা পাণ্ডে, আলোক চৌধুরী, মীতু কানোরিয়া, ড. রজনী শর্মা 'চন্দা', জ্ঞানপ্রকাশ পাণ্ড্যে, রামনাথ বেখবর, রামপুকার সিংহ এবং রমাকান্ত সিনহা।

সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সত্যনারায়ণ রায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বংশীধর শর্মা।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার তিরোধান উপলক্ষ্যে মালদায় ক্ষত্রিয় সমিতির জেলা সম্মেলন

রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ৯১তম তিরোধান উপলক্ষ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর মালদা জেলার ধুমাদিঘিতে (আটমাইল) সম্পন্ন হলো জেলা ক্ষত্রিয় সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির রাজ্য সভাপতি ভবানীচরণ সিংহ, রাজ্য সম্পাদক প্রেমানন্দ অধিকারী। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নাতি তিমির কুমার বর্মা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য গোবিন্দ ঘোষ এবং উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতা ও ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার। এরপরে বক্তব্য রাখেন রাজ্য পর্যবেক্ষক সৌমেন রায়, প্রেমানন্দ অধিকারী ও তিমির কুমার বর্মা। সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নগেন্দ্রনাথ বর্মনের রাজবংশীভাষায় লিখিত রামায়ণ সকলের সামনে উল্লেখ করা হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা সম্পাদক ভূপেশ বর্মন।

প্রকাশিত হলো 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে নেতাজী?' বইটি

গত ৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হলো বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নেতাজী গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী রচিত 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে নেতাজী?'-শীর্ষক বইটি। এদিন মধ্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে দীপ প্রকাশনের শোরুমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় বইটি। পুস্তক প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বইটির লেখক ড.

জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন 'দ্য ভিউস এক্সপ্রেস' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং তথ্যচিত্র পরিচালক মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট'-এর অধ্যক্ষ ড. দীপক বরপণ্ডা, রাসবিহারী বসু রিসার্চ ব্যুরো-র প্রতিষ্ঠাতা তপন ভট্টাচার্য, দীপ প্রকাশনীর সিইও সুকন্যা মণ্ডল, 'দেশলোক' পত্রিকার সম্পাদক এবং নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির মুখ্য প্রশাসক প্রণব ভূষণ গুহ প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ঢাকা থেকে ড. সুব্রত ঘোষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক প্রবীর কুমার সরকার। একটি সুন্দর গানের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। রজনীকান্ত সেনের 'জাগাও পথিকে, ও যে ঘুমে অচেতন' গানটি পরিবেশন করেন তপতী চক্রবর্তী এবং রত্না সরকার। এরপর অনুষ্ঠানের মূলপর্বে বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে ইতিহাসের নানারকম আলোচনা ও বিশ্লেষণ, যা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর বক্তব্যে লেখক ড. জয়ন্ত চৌধুরী বলেন যে, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও নেতাজী সংক্রান্ত গোপন ফাইল এবং বিভিন্ন নথিপত্র ধ্বংস করা হয়েছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, নেতাজী বেঁচে রয়েছেন। তা না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। আমি কলকাতায় গিয়ে জনসভায় সব বলব। তার কয়েক সপ্তাহ পরে কলকাতায় ব্রিগেড ময়দানে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মঞ্চে উঠে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেও মুজিবুরের কণ্ঠে নেতাজীর নাম উচ্চারিত হয়নি। এমন নানা বিষয় উঠে এসেছে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে নেতাজী?' বইটিতে। ভিড়ে ঠাসা নেতাজী অনুরাগীদের এই সভায় একাধিক তথ্য-প্রমাণ-সহ ড. জয়ন্ত চৌধুরী দেখান যে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত সত্য ১৯৭১-পরবর্তী পর্যায়ে কীভাবে গোপন করা হয়েছিল। তিনি জানান যে, আমেরিকার আর্কাইভে থাকা 'ফ্যাসিস্ট লিস্ট'-নামক তালিকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম থাকলেও সম্প্রতি তাঁর নাম সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশনের কিছু সাক্ষীর সাক্ষ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যোগ স্পষ্ট হয়েছে বলেও ড. চৌধুরী জানান। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রিয়ম গুহ।

চাঁচোলে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ৯ সেপ্টেম্বর উত্তর মালদা জেলার চাঁচোলের পাহাড়পুরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে এর নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের অয়োজন করা হয়। শিবিরে পাহাড়পুর ও আশেপাশের গ্রামের ১৪৪ জন মানুষ এই স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। এতে ২৬ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ১৬ জনের সুগার টেস্ট, ২০ জনের দাঁতের চিকিৎসা, ২৬ জনের চক্ষু পরীক্ষা এবং ২৬ জন মহিলার স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করা হয়। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যজিৎ সাহা, চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কর দাস, দন্ত চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিস রায়চৌধুরী পূর্ণ সময় উপস্থিত থেকে এই শিবির সুসম্পন্ন করেন। সহযোগিতায় ছিলেন স্থানীয় সেবিকা বোন এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা।

উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সহ প্রান্ত কার্যবাহিকা শ্রীমতী সুজাতা মিত্র, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগ সঙ্ঘচালক পীযূষকান্তি সাহা, উত্তর মালদা জেলা সঙ্ঘচালক দেবব্রত দাস।

উদ্‌যাপিত হলো স্বাধীনতা যোদ্ধা বিপ্লবী যতীন দাসের ৯৬তম আত্মবলিদান দিবস

গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুবীর কুমার কুণ্ডুর উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা পুরসভার সহায়তায় কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশান এবং যতীন দাস পার্ক— এই দু'টি স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন স্মরণ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার তথা বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতির সভাপতি তপন সিনহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বাগচী বিশ্বাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উত্তরসূরী প্রসাদ রঞ্জন দাশ, বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তী ও বিপ্লবী ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর পৌত্রী মিঠু চক্রবর্তী, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা পূরবী সেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তর ভ্রাতুষ্পুত্র পরিমল সেনগুপ্ত, বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পৌত্র অধীশ ভট্টাচার্য্য, বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পৌত্রী রমা রায়, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষের কন্যা মিতালী সরকার প্রমুখ বিশিষ্টজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী ভগৎ সিংহের সহকর্মী। আত্মত্যাগী, সাহসী এই বিপ্লবী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯২৯ সালের ১৪ জুন গ্রেপ্তার হন। জেলবন্দিদের অধিকারের দাবিতে ওই বছরই ১৩ জুলাই তিনি অনশন শুরু করেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় একটানা ৬৩ দিন অনশনের পর ১৩ সেপ্টেম্বর মাত্র ২৪ বছর বয়সে লাহোর জেলেই প্রাণ দেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে বিপ্লবী দেবেশ চন্দ্র কুণ্ডুর নাতি তথা বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতির সম্পাদক সুবীর কুমার কুণ্ডু নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে বরেণ্য বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের বহু সদস্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ফ ঃ ৪

গাজোলে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত মালদহ জেলার গাজোল মনোমোহন শ্রীমতীদেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মালদহ জেলা কার্যরকর্তাদের এক প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। বর্গে ৩২ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক আশিস সরকার, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য কল্যাণ কুমার মণ্ডল, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়, জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সহ সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী যুব প্রমুখ জয়জিৎ সরকার, কোষাধ্যক্ষ জয়প্রকাশ বিশ্বাস প্রমুখ। শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলন করেন উপস্থিত অতিথিগণ। তারপর সমবেত গান হয়।

কৃষি সংকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আশিস সরকার। সংগঠনের রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করেন কল্যাণ কুমার মণ্ডল। কার্যপদ্ধতি এবং গ্রাম সমিতি বিষয়ে আলোচনা করেন অনিল চন্দ্র রায়। বর্গ সঞ্চালনা করেন পরেশ চন্দ্র সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে দ্য বেঙ্গল ফাইলস্ প্রদর্শন বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভা

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্দেশক বিবেকরঞ্জন অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস্' চলচ্চিত্রটি পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা হলগুলিতে প্রদর্শন বন্ধের প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিলিগুড়ি শাখার উদ্যোগে গত ৯ সেপ্টেম্বর এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। পরিষদ কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বহু মানুষ যুক্ত হয়ে মিছিল করে পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে ভেনাস মোড়, হিলকার্ট রোড হয়ে মহকুমা শাসকের অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মাঝে মাঝে পথসভা করে পরিষদ কার্যকর্তারা ভাষণ রাখেন। পরিচালনায় ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল এবং প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী অনুপ কুমার মণ্ডল।

মহিষাদলে স্বদেশী স্বাবলম্বন বিষয়ক আলোচনা সভা

গত ৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল প্রণবানন্দ প্রাইভেট আইটিআই কলেজে স্বদেশী স্বাবলম্বন বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিষাদল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী গৌতম মহারাজ। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাঁর ভাষণে স্বাবলম্বনে স্বদেশী উদ্যোগের আহ্বান জানান। স্বদেশী জাগরণ ও সংকল্পবাক্য পাঠ করান স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সহ প্রান্ত সংযোজক নারায়ণচন্দ্র পণ্ডা। কলেজের অধ্যক্ষ বৃন্দাবনবাবু কলেজের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বদেশী ববেহারের আবেদন জানান। শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী স্বদেশী গ্রহণ এবং বিদেশি বর্জনের শপথ গ্রহণ করেন। সভায় ৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শংসাপত্র দান করা হয়। সমবেত কণ্ঠে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' গান গেয়ে সভার সমাপ্তি হয়।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১১১তম আত্মবলিদান দিবস উদ্‌যাপন করল চট্টগ্রাম পরিষদ

প্রতিবছরের মতো এবারও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হলো বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মাহুতি দিবস। বঙ্গভূমিতে তাঁর পরিচয় হলো 'বিপ্লবী বাঘাযতীন'। গত ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় উদ্‌যাপিত হয় তাঁর ১১১তম আত্মবলিদান দিবস। চট্টগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় এদিন মূল অনুষ্ঠানটি হয় ভিক্টোরিয়ার সন্নিকটে বিপ্লবীর ঘোড়ায় চড়া মূর্তিটির সামনে। এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চট্টগ্রাম পরিষদের কার্যকরী সভাপতি পীযূষকান্তি সেন, পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রদীপ কুমার সেন-সহ পরিষদের অন্যান্য সদস্য বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস এবং বহু বিশিষ্টজন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বাচিক সংসদের শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এখানে পরিবেশন করা হয় একটি দেশাত্মবোধক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা সমাবেশস্থলটিকে প্রাণবন্ত করে রাখেন। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ওড়িশার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর ধারে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হন সিংহ-হৃদয় বিপ্লবী বাঘাযতীন, বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, বিপ্লবী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিপ্লবী নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র পাল। আহত অবস্থায় মৃত্যুর আগে বিপ্লবী বাঘাযতীন বলেছিলেন--- 'আমরা মরব, জগৎ জাগবে'। ৯ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর দিবস এবং ১০ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী বাঘাযতীনের আত্মাহুতি দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর কলকাতার বাঘাযতীন অঞ্চলের স্কুলগুলিতে এবং বাঘাযতীন স্টেশন চত্বরে বিপ্লবী বাঘাযতীনের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এবং পূর্ণমর্যাদার সঙ্গে দিন দু'টি কলকাতা জুড়ে উদ্‌যাপিত হয়।

বিপ্লবী বাঘাযতীনের আত্মত্যাগ ও অবদান স্মরণে গত ১৪ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বাঘাযতীন হাইস্কুলের প্রাক্তনীরা তাঁদের স্কুলে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ২৪ আগস্ট সিউড়ী সংলগ্ন হাটজনবাজার কাননপল্লীতে ৮৫ বছর বয়স্ক কর্মযোগী নিমাই স্বর্ণকারকে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন শিক্ষক শ্রীকান্ত ঘোষ ও সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। শ্রীস্বর্ণকারকে চরণ ধৌত করে পূজা করেন তাঁর বউমা বর্ণালী স্বর্ণকার। মাল্যদানে ভূষিত করেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার স্বপন ভট্টাচার্য। মানপত্র পাঠ করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। সংগঠনের উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীগীতা, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করেন অনুভবী সৌমেন সিংহ, বন্দনা দাস, মিনতি দাস, ও সুজাতা বিষ্ণু। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় ও সুজাতা বিষ্ণু। পিতার সম্পর্কে অনুভব বর্ণনা করেন তাঁর কনিষ্ঠপুত্র সঞ্জিত স্বর্ণকার। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায় এবং নাতি সায়ন স্বর্ণকার। কৃতজ্ঞতা জানান ইন্দ্রজিৎ দাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পতিত পাবন বৈরাগ্য।

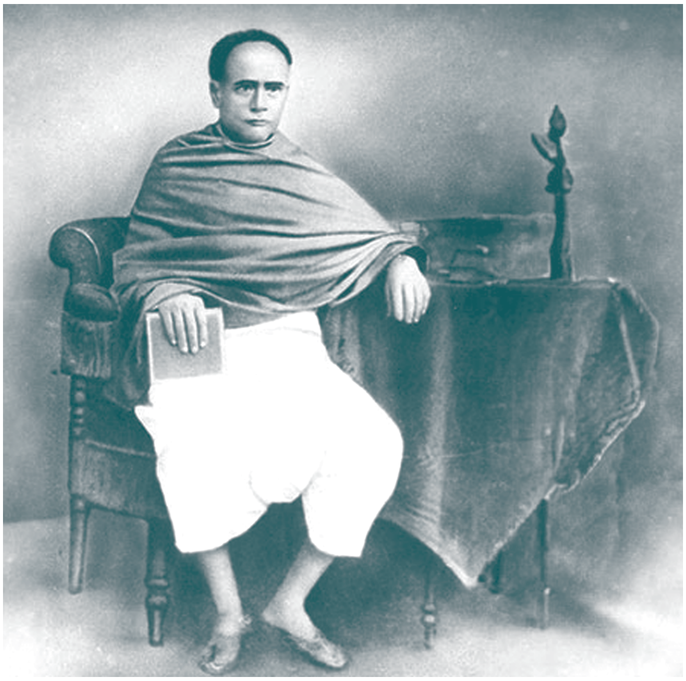

পুণ্য শ্লোক, পবিত্র ঋষি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কল্যাণ গৌতম

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী চিন্তাবিদেরা সব সময় প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিদ্যাসাগরকে ধর্ম-উদাসীন, মানবতাবাদী চরিত্র হিসেবে। তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বকে। কিন্তু মূল সত্যিটা হলো, পরাধীন ভারতবর্ষে নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করলে দেশের সামাজিক সংস্কারের কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে তিনি বাস্তববাদী ছিলেন। সেই পথে যেতে হলে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপোশ করেছেন। আর তার জন্যই ধর্ম-আধারিত সমাজ সংস্কার করতে পেরেছেন। 'ধর্ম বিযুক্ত বিদ্যাসাগর' বলে কোনো কথা হয় না।

মনে রাখতে হবে, তিনি যখন কর্মজীবন শুরু করছেন (১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর) কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে তার বছর ছয়েক আগে (১৮৩৫ সালে) মেকলে সাহেব ভারতীয় সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত নাড়িয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ব্রিটিশ ভারতের চিন্তাচেতনা।

মেকলের নীতি অনুসরণ করে ভারতে ব্রিটিশরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা হিন্দুধর্মের অনুসারী পাঠ যথাসম্ভব পাঠ্যসূচিতে রাখবে না, হিন্দুধর্মের গরিমা-প্রকাশক কোনো পাঠ্য তো নয়ই। চাকরি জীবনের প্রথমে এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরকে আমরা বিশেষভাবে প্রকাশ হতে দেখি। কেউ কখনো অস্বীকার করতে পারবেন না, বিদ্যাসাগরের আনা নবজাগরণ ছিল হিন্দু-নবজাগরণ। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, নিজের আরব্ধ কাজ করার জন্য শাস্ত্রীয় যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বহু রচনাই হিন্দুধর্ম আধারিত।

অনুবাদক বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে আমরা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) নামটি জানলেও আমরা অনেকেই জানি না, তাঁর প্রথম অনুবাদ ছিল 'বাসুদেবচরিত'। নমুনা যা পাওয়া গেছে, অসাধারণ সুললিত ছিল এই গ্রন্থ, অনুবাদ-কর্মের প্রথম পরীক্ষা, লিপিচাতুর্য আর ভাষা-সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এর পাণ্ডুলিপিটি রচিত হয় সম্ভবত ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজে চাকুরিরত অবস্থায় (১৮৪২-১৮৪৬ এর মধ্যে)। বিদ্যাসাগর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার অনুমান করেছিলেন, এ আখ্যানে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কাহিনি গৃহীত হয়েছিল বলে ফোর্ট উলিয়াম কর্তৃপক্ষ এটি কলেজের পাঠ্য গ্রন্থরূপে গ্রহণ ও প্রকাশ করতে সম্মত হয়নি। বাংলা সাহিত্যের তন্নিষ্ঠ গবেষক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন, 'বাসুদেবচরিত' বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরে আর এই পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগর নিজে তা পরে প্রকাশ করতে চেয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং জীবনীকারদের দেখিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, এই বোধে হয়তো বিদ্যাসাগর নিজেকে পরবর্তী সময়ে পরিচালিত করে থাকবেন। তারই অনুভবে নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে থাকবেন। হিন্দুধর্মের প্রচার করতে গিয়ে সাহেবদের চটালে, তাঁর সমাজসংস্কারের কাজ পাছে বাধা পায়, সেজন্য অন্যভাবে হিন্দুধর্মের সামীপ্যে সান্নিধ্যে বিরাজ করবেন।

তখন প্রগতিশীলতা মানেই ছিল ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়া, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে ব্রাহ্ম হতে দেখিনি আমরা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্ম মনীষীর সঙ্গে তাঁর চির ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিনি হিন্দুই থেকে গেছেন। বরং প্রিয়পাত্র শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম হয়ে গেলে তা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত, ব্যথিত করেছিল।

বিদ্যাসাগরের লেখা চিঠিপত্রের শীর্ষে অবশ্যই স্থান পেত 'শ্রীহরি শরণম্'। এটা দেখবার মতো ব্যাপার। শুধুই কি আচার পালন!

হিন্দুধর্মের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ ও কটূক্তি তিনি কখনোই মেনে নেননি। একসময় সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারক একটি মামলার রায়দানের সময় প্রসঙ্গ-বহির্ভূতভাবে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কটুকথা বলেছিলেন, অশালীন কথা বলেছিলেন; তার প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর, গর্জে উঠেছিলেন তিনি। কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় নেতৃত্ব দিলেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ হাজার গণ্যমান্য মানুষের স্বাক্ষর সংবলিত একটি চিঠি পাঠালেন ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সেক্রেটারিয়েটে। চিঠির গুরুত্ব অনুভব করে ব্রিটিশ সেক্রেটারিয়েট ভারত সরকারকে নির্দেশ দিল, সুপ্রিম কোর্টের সেই বিচারককে সতর্ক করে দিতে হবে। জয় হলো বিদ্যাসাগরের, জয় হলো হিন্দুর।

হিন্দুধর্মে যে দশটি মানবিক গুণ থাকলে যিনি যথার্থ ধার্মিক হতে পারেন, তার সমস্ত গুণই বিদ্যাসাগরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই— ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ। যদি তাই হয় তবে তিনি অবশ্যই হিন্দু, অবশ্যই ধার্মিক।

ব্যিদাসাগর গীতার উপদেশ অনুসারে চলবার কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁর স্নেহধন্য ও পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার অমূল্য চরণ বসু (১৮৬২-১৮৯৮; ১৮৮৬ সালে কলকাতা মেডিক্যাল স্কুল থেকে এমবি উত্তীর্ণ) একবার বিদ্যাসাগরের ধর্মবোধ ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'গীতার উপদেশ অনুসারে চললেই ভালো হয়।'

কোনো এক ভয়াবহ লঞ্চডুবিতে প্রায় ৮০০ জন আরোহীর মৃত্যু হলে তিনি সখেদে বলে উঠেছিলেন, 'দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, ঠাকুরের ভক্তেরা অভিমত প্রকাশ করে বলেন, বিদ্যাসাগর ঈশ্বর মানেন না, তিনি নাস্তিক। শ্রীরামকৃষ্ণ মত প্রকাশ করে বলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে কোনো মানুষ এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারেন না। তিনি কলকাতার বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন।

নানান সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও তার সুলুকসন্ধান করেছিলেন, গভীরে গিয়েই পাঠ করেছিলেন শাস্ত্রীয় আপ্তবাক্য। কিন্তু তবুও তিনি নিরীশ্বরবাদী। বলা হয়ে থাকে বুদ্ধের পর বিদ্যাসাগরই প্রথম ভারতীয় মনীষা যিনি ঈশ্বর নিয়ে চিন্তা করেননি। গৌতমবুদ্ধ যেখানে হিন্দুদের দশাবতারের একজন হয়ে উঠলেন, তবে কেনই-বা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঈশ্বরচন্দ্র' হয়ে উঠবেন না? যিনি কর্মফলের আশা না করে নিষ্কাম কর্ম করে গেছেন এবং অক্ষয় মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন। গীতার উপর আস্থা রেখেছিলেন, তিনি তো কর্মযোগী হিন্দু সন্ন্যাসীই হবেন! তাই নয় কী?

বিদ্যাসাগরের জীবনে আরও একটি ঘটনা থেকে মনে হয়, তিনি ব্রাহ্ম কিংবা খ্রিস্টান মহিলাদের তুলনায় হিন্দু মহিলাদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে স্ত্রী শিক্ষাবিদ মেরি কার্পেন্টার ভারতে আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বেথুন স্কুলে একটি শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইলেন। কারণ এতদিন বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষেরা পড়াতেন।

বিদ্যাসাগর প্রথমে কার্পেন্টারকে সঙ্গ দিলেও পরে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিলেন। যুক্তি ছিল সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত বয়স্কা মেয়ে পাওয়া যাবে না। বিপুল সামাজিক বাধা আসবে তাদের প্রতি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটা তো হিন্দু ঘরের মেয়েদের জন্য সত্য। শিক্ষিকা হিসেবে তো ব্রাহ্ম মহিলারাও আসতে পারতেন; খ্রিস্টান মহিলারাও আসতে পারতেন, তাদের জন্য তো সত্য নয়। তারা তো অনেকেই শিক্ষিতও ছিলেন, সামাজিক বাধাও পেতেন না সেভাবে। তাহলে কী বিদ্যাসাগর মনে করেছিলেন, শিক্ষিকা হিসেবে হিন্দু মেয়েরা সুযোগ না পেলে, শিক্ষা জগতে ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান শিক্ষিকারা দাপিয়ে বেড়াবে? ধর্মীয় প্রভাব ফেলবে? একজন হিন্দু পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া আর একজন হিন্দু নারীকে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে অনেক তফাত। শিক্ষিকা হিসেবে হিন্দু নারীর মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরূপ চিন্তন তৈরি করে দিলে তা হিন্দু সমাজে দীর্ঘকালীন ক্ষতি করে দিতে পারে, এটা পরিষ্কারভাবে হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। তাই সেই ফাঁদে পা দেননি।

বিদ্যাসাগর যুক্তি দেখালেন, বিধবা বিবাহে বিধবা মেয়ে ঘর পাচ্ছে, কিন্তু নতুন বিদ্যালয়ে ঘরের মেয়ে বাইরে আসার সূচনা হবে। এটা কয়েক বছরের শিক্ষা লাভের বিষয় নয়। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন তা সমাজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ এখানে যদি হিন্দু সম্পন্ন ঘরের কোনো মেয়ে আসে, তার বিধবা হবার সম্ভাবনাই বেশি। বিদ্যাসাগরের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল, বিধবা বিবাহের ফলশ্রুতিতে বিধবা আপন ঘর পাক। তাঁর নিজের উক্তি 'বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা কোনো সৎকর্ম করিতে পারিবো, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।' সৎকর্ম করা হিন্দুধর্মের এক পবিত্র কাজ। বিদ্যাসাগর শুধু সমাজ সংস্কারক নন, তিনি হিন্দু ধর্মের অভিমত ও প্রথা মেনে চলার পন্থী এক সংস্কারক।

বিদ্যাসাগরের ধর্মে মতি না থাকার পশ্চাতে একটি মনস্তাত্ত্বিক নিবৃত্তি হয়তো কাজ করে থাকবে। যে গরিব ঘরের ছেলেটি জানতেন তার ঠাকুরদা (পণ্ডিত রামজয় তর্কভূষণ) সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়েছেন; ঠাকুমা (দুর্গাদেবী) প্রবল দুরবস্থায় পড়েছেন তার ছয় ছেলে-মেয়ে নিয়ে; সুতো কেটে বাজারে বিক্রি করে যে মহিলাকে সংসার চালাতে হয়; যার ১৫ বছরের ছেলেকে কাজ জোটাতে গিয়ে কলকাতার পথে পথে চলতে গিয়ে ক্ষুধায় মূর্ছা যেতে হয়, সেই পরিবারের একজন সংবেদনশীল অতল জ্ঞানী সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অথচ মানব দরদির ধর্মে বিশেষ মতি থাকলে, 'ঘর পোড়া গোরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরানো'-র মতো অবস্থা হয় পরিবারের। তিনি নিজেও সদাসর্বদা খেয়াল রাখেন, অধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম দর্শন যেন তাকে অন্তত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী না করে তোলে। আর বিদ্যাসাগর তো সন্ন্যাসীই ছিলেন; মননে, কর্মে বাস্তববোধে।

প্রাচীন ঋষিদের মতো যার প্রজ্ঞা আর পাণ্ডিত্য, মানুষের জন্য যার অপরিমিত দয়া বাঙ্গালি রমণীর মতো কোমল করে তোলে, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী না হয়ে যান না। তিনি পুণ্যশ্লোক, তিনি পবিত্র ঋষি। □

রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা শিশুশিক্ষা উপযোগী পুস্তক

সুতপা বসাক ভড়

বাল্যশিক্ষা বলতে আমরা বুঝি বাল্যকালে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। শিশুমন হলো মাটির তাল। তাকে যেমন ছাঁচে ঢালা হবে, তেমনই সৃষ্টি হবে। সুতরাং সেই শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ যত্নশীল হতে হবে এমনটাই কাম্য। আমাদের প্রথম পাঠ্যপুস্তকটি আমাদের জীবনের পথ অনেকাংশে নির্দিষ্ট করে দিতে সক্ষম। সমগ্র জীবনে আমরা অনেক বইপত্র পাঠ করে থাকি, বর্তমানে প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা অনেক কিছু সম্পর্কে অবহিত হই, কিন্তু প্রথম পাঠ্যপুস্তকটি মন ও মস্তিষ্কের বিশেষ দাগ কেটে যায়। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে— 'জাতির সমগ্র লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের হাতে রাখিতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব ইহা জাতীয় ধারায় এবং জাতীয় প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।' (ভারত কল্যাণ পৃ. ৫০-৫১)

রামসুন্দর বসাকের লেখা এমন একটি বহুল প্রচলিত আদি শিশু পাঠ্য--- 'বাল্যশিক্ষা'। বর্তমানে পুস্তকটি প্রাপ্তিস্থান : সীতানাথ আদর্শ লাইব্রেরী, ৪২বি, সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯; (কলেজস্ট্রিট)। মূল্য : পঁচিশ টাকা। এই গ্রন্থটি ইংরেজি ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এবং এটির সকলে স্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

গ্রন্থটিতে প্রথমদিকে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয়, পরীক্ষা ইত্যাদি আছে। এখানে আছে অর্থপূর্ণ বর্ণযোজনা, স্বরবর্ণ যোজনা, সংযুক্ত কতিপয় বর্ণের আকার পরিবর্তন, সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উদাহরণ ইত্যাদি। যুক্তাক্ষরের শিক্ষা এবং প্রয়োগ অসাধারণ। বাক্যগুলি শিক্ষণীয় ও বাঙ্ময়। সরল বাক্যগুলির মাধ্যমে অতি উচ্চমানের নীতিশিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এখানে আছে ছোটোদের মতো করে রামায়ণ, মহাভারত। আছে পশুর নাম, শস্যের নাম, বৃক্ষের নাম, ফুলের নাম, পক্ষীর নাম, বস্তুর নাম, মাছের নাম, বাদ্যযন্ত্র, ফলের নাম, রস, রং, দশদিক। বঙ্গের সাতবার, বাঙ্গালির বারোমাস, ছয় ঋতু, তিথি ও পক্ষ, পাঁচ ইন্দ্রিয়, ধাতু, গ্রহণ আদি। এছাড়াও আছে শিক্ষামূলক কবিতা ও গত্য। এমনকী, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সাতবার, বারোমাস ইত্যাদিরও উল্লেখ করেছেন আমাদের জ্ঞাতার্থে।

এছাড়া, মাত্র নয়টি পঙ্ক্তিতে শিশুদের মতো করে রামায়ণ এবং মাত্র সাতটি পঙ্ক্তিতে অতি সহজ অথচ প্রাঞ্জল, ছোটো ছোটো রাজ্যের মাধ্যমে মহাভারত বর্ণিত হয়েছে রামসুন্দর বসাকের লেখা বাল্যশিক্ষাতে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ইংরেজি ৩/১/১৮১৭--- ১/৩/১৮৫৮ সালের মধ্যে লেখা কবিতাটি— 'প্রভাত বর্ণনা' স্থান পেয়েছে এখানে।

আমরা অনেকেই বাংলাভাষা ও বাঙ্গালি হবার জন্য আত্মাভিমান করে থাকি, অথচ এখনো পর্যন্ত অসম, ত্রিপুরা, তৎকালীন পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশে) বহুল প্রচলিত এই আকর গ্রন্থখানি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষ অবহিত নন। অসম, ত্রিপুরাতে এখনও শিশুদের প্রথম পাঠ্যপুস্তক রূপে এটি স্বীকৃত। গ্রন্থটির মূল পাঠ্য বিষয় মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে নিহিত হলেও এরা বিষয়বস্তু অতি গভীর। যেকোনো বয়সের বাংলা ভাষাভাষীরা এটি পাঠ করে ঋদ্ধ হবেন, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। প্রত্যেক গৃহের জন্য এটি একটি সংরক্ষণযোগ্য পুস্তক। আমরা জানি সন্তানের প্রথম শিক্ষক হলেন 'মা'। সেজন্য মায়েরা যেন অবশ্যই এটি সংগ্রহ করে নেন। তবে 'অনলাইন' ক্রয় করা থেকে তাদের মতো করে এটি প্রকাশ করেছে। ইসলামি বাল্যশিক্ষা নামেও একটি পুস্তক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যা মূল গ্রন্থের পরিপন্থী।

আগরতলা ত্রিপুরা নিবাসী ড. জগদীশ গণচৌধুরীর (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজসেবী এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিবিই কলেজ, আগরতলা) বিশেষ পথনির্দেশে শ্রীরামসুন্দর বসাক কৃত আদি শিশু-পাঠ্য 'বাল্যশিক্ষা' গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করা হলো। আশা করি আদর্শ শিশুপাঠ্য রূপে এটি আমাদের প্রত্যেকের গৃহের পুস্তক ভাণ্ডারের নিজগুণে স্থান করে নেবে। □

পাঁশকুড়ায় ভট্টাচার্য পরিবারের পাঁচশো বছরের প্রাচীন দুর্গাপূজা

জয়জ্যোতি ভট্টাচার্য

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার ভট্টাচার্য পরিবারে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে হয়ে আসছে দুর্গাপূজা। প্রথম দিকে পূজা হতো নবপত্রিকায়। পরে শুরু হয় মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ীর আরাধনা।

এ বাড়িতে দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ তো থাকেনই, থাকেন জয়া-বিজয়াও। দেবী মায়ের সঙ্গে পূজা হয় তাঁদেরও। বলিদান প্রথা নেই। নেই চণ্ডীপাঠের নিয়মও। তবে সন্ধিপূজা হয়, যদিও ১০৮ দীপদানের রীতি নেই।

মায়ের ভোগরাগ হয় রাতে। দেবীর নাকে রয়েছে তিলক, তাই তাঁর হয় নিরামিষ ভোগ। তবে সন্ধিপূজায় মাকে নিবেদন করা হয় আমিষ ভোগ। জ্যান্ত মাছ কেটে রান্না করে দিতে হয়। পূজার দিনগুলিতে প্রসাদ পান কয়েকশো ভক্ত। দেবী দর্শনে আসেন দূরদূরান্তের লোকজনও। তাঁদের বিশ্বাস, ভট্টাচার্য বাড়ির দেবী খুবই জাগ্রত। কায়মনোবাক্যে কিছু চাইলে দেবী কাউকে বিমুখ করেন না।

এক সময় বংশ পরম্পরায় ঠাকুর গড়ত এক মৃৎশিল্পীর পরিবার। গত চল্লিশ বছর ধরে প্রতিমা তৈরি করছেন তমলুকের মঙ্গল মিস্ত্রি। তিনি বলেন, 'ভট্টাচার্য বাড়ির মায়ের চক্ষুদান করার পরে আমি অন্যান্য প্রতিমার কাজ করি। এখানকার মা খুব জাগ্রত।' এই পূজার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় সিংহ পরিবার। এই পরিবারের প্রবীণ সদস্য দিবাকর সিংহ বলেন, 'এখানে খুব নিষ্ঠা সহকারে পূজা হয়। মা খুবই জাগ্রত।' স্থানীয় বাসিন্দা চণ্ডীদাস ঘোষাল বলেন, 'এই পূজা ঠিক কত বছরের পুরানো, তা জানি না। তবে আমরাও বাবা-কাকাদের কাছে শুনেছি, এই বাড়ির পূজা বহু পুরানো। মা খুবই জাগ্রত।'

ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্যরাই পূজা করেন। বর্তমানে পূজা করেন গুরুদাস ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আমিও জানি না ঠিক কত বছরের পুরানো পূজা। তবে শুনেছি, প্রায় পাঁচশো বছর ধরে পূজা হয়ে আসছে এই পরিবারে।' তিনিই জানান, গুরুদেবের কথামতো বংশরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই পরিবারে পূজা শুরু হয়েছিল।

সেই থেকে এখানে পূজা হয়ে আসছে এ বাড়িতে। বাড়িতে নিত্য পূজা হয় নারায়ণের। এই নারায়ণের মন্দিরের পাশেই মায়ের মন্দির। অবশ্য মন্দির বলতে যা বোঝায়, তেমন নয়। জমিদার বাড়ির ধাঁচে তৈরি চণ্ডীমণ্ডপ। আগে ছিল মাটির। পরে হয়েছে পাকা। সেই মণ্ডপেই আরাধনা হয় দেবী চণ্ডীর। চণ্ডীমণ্ডপের সামনেই রয়েছে একটা শিউলি গাছ। শারদ প্রাতে ঝরে পড়ে রাশি রাশি শিউলি। মৃদু গন্ধে ভরে উঠে চারিদিক। আকাশে ভেসে বেড়ায় পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। মহালয়ার ভোরে মায়ের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে শাঁখে ফুঁ দেন গাঁয়ের বধূরা। পূজার আগে আগে ভট্টাচার্য বাড়ির সামনে উড়ে বেড়ায় একটা নীলকণ্ঠ পাখি। মায়ের আগমনী বার্তা বয়ে আনে বুঝি। দশমীতে পান্তা ভাত খেয়ে ভট্টাচার্য বাড়ির দেবী ফিরে যান কৈলাসে। এদিন মাকে পান্তা ভাতের সঙ্গে শাকভাজা ও দই দেওয়ার প্রথা প্রচলিত। দেবী ফিরে যাওয়ার পরপরই কোথায় যেন হারিয়ে যায় নীলকণ্ঠ পাখিটাও। পাখিটার দেখা মেলে ঠিক এক বছর পরে, আবারও মহালয়ার ভোরে। ভট্টাচার্যদের প্রতিবেশীদের বিভিন্ন বাড়ির বহু পুরানো রেডিয়োতে তখন বেজে চলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠের সেই চিরন্তনী বাণী, আশ্বিনের শারদ প্রাতে...। □

হবে না; তখন 'চাণক্য উবাচ' বড্ড প্রাসঙ্গিক ঠেকে। চাণক্য শ্লোকটি আরও প্রাসঙ্গিক ঠেকে যখন গত ২০ আগস্ট ভারতের সংসদে সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, এবং তারপরই দুর্লভ প্রতিবাদে দেখা গেল একজোট ইন্ডিজোট। যারা সততার ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে দিন যাপন করে, তাদের কাছে এহেন সংশোধনী প্রস্তাবে রাজনৈতিক ইমেজ ডুবে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রস্তাবিত এই আইনের বিরোধিতায় তাদের দেওয়া রাজনৈতিক লেকচারগুলিও আগামীদিনে হাবুডুবু খাবে বা মুখ থুবড়ে পড়বে একথাও স্পষ্টভাবে বলা যায়। দুর্নীতিরাজ এবং নীতিহীন প্রশাসনিক কাঠামো বরদাস্ত করতে রাজি নয় একবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত নতুন ভারত। কিন্তু এই দেওয়াল লিখন পড়তে ব্যর্থ ইন্ডিজোট। তাদের পক্ষ থেকে একটাই রোল উঠতে দেখা যাচ্ছে— এই সংশোধনী অগণতান্ত্রিক, এই আইন হলো স্বৈরাচারের নমুনা, আইনটির অপপ্রয়োগ করবে কেন্দ্রীয় শাসককুল বা কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন শাসক দল, বাড়বে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার।

ভবিষ্যতে কেউ এই আইনের অপপ্রয়োগ করতে পারে, সেই কারণে আইনটিই প্রণয়নের প্রয়োজন নেই— এই যুক্তি শুধুমাত্র ভিত্তিহীন নয়, রীতিমতো হাস্যকর। কেন 'দুর্নীতিমুক্ত দেশ' হয়ে ওঠার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে না আজকের ভারত?

১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল

রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটে পড়তে পারে দুর্নীতিগ্রস্ত, পরিবারতান্ত্রিক দলগুলি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে—
'অসম্ভবং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ।।'

অর্থাৎ শিলা জলে ভাসছে, বানর গান গাইছে— যদি দেখো বা প্রত্যক্ষ করো, তাও সেটা বোলো না, বা এইসব অসম্ভব বিষয়ে মনে যেন প্রত্যয় না জন্মায়। বর্তমানে ইন্ডিজোটের সততার কীর্তন যেন ঠিক তেমনটাই। তাদের ভাবসাব যেন সততার পরাকাষ্ঠা তারা। তাদের দাবি হলো দেশ তাদের হাতে সুরক্ষিত। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই নিজেকে সেই কোন কাল থেকে পোস্টারে, ব্যানারে লিখে চলেছেন— 'সততার প্রতীক'। তারপর যখন দেখা যায় যে, তার ক্যাবিনেট থেকে পঞ্চায়েত প্রধান সবাই নিয়মিত প্রতিযোগিতা করে দুর্নীতিতে শামিল হয়, বিভিন্ন মামলায় রাজ্য সরকারকে আদালতে একরকমভাবে বলতে হয়— আর চুরি আইনের অপপ্রয়োগ হলেও সেই অব্যবস্থা খুব কম সময়ের জন্যই বলীয়ান থাকে। কারণ দেশের বিচারব্যবস্থা স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। তাই কোনো সরকার আইনের অপপ্রয়োগ করলেও সেই মিথ্যা অভিযোগ আদালতের দৃষ্টিতে মিথ্যা মামলা হিসেবেই পরিগণিত হয়। এদিকে রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা একটি ইতিবাচক সংস্কারের বিরোধিতা করছেন এই যুক্তিতে অনড় থেকে যে, যদি কখনও ভবিষ্যতে এই আইনের অপপ্রয়োগ হয়। গণতন্ত্রের পীঠস্থান হলো— সংসদ। সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে 'ফ্লোর বিলংস্ টু দ্য অপোজিশন'। অর্থাৎ দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষার্থে সংসদের অভ্যন্তরে বিরোধী স্বর সর্বদা গুরুত্ব পাবে। ভারতের সংসদে বর্তমান বিরোধী দলগুলির জোট বা ইন্ডিজোটের পক্ষ থেকে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষায় জোর দেওয়ার বিষয়টি ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি প্রমাণ করার পরিবর্তে যেন বেশি করে নানা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কী রয়েছে এই বিলে? ঠিক

ফঃ ৫

কোন কোন ফাঁক আবিষ্কার করে বিরোধিতা চলছে ১৩০তম সংবিধান (সংশোধনী) বিলের? এক কথায় এ হলো— গ্রেপ্তারির পর ৩০ দিনের বেশি কারাবাস হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মন্ত্রীপদ অপসারণের বিধান। যদি কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনো মন্ত্রী, এমনকী প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বা বিধানসভা-যুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোনো মন্ত্রী কোনো গুরুতর অপরাধে যদি ধারাবাহিকভাবে ৩০ দিন হেফাজতে থাকেন, তবে ৩১তম দিনে তাঁর মন্ত্রিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারিজ হবে। এই ক্ষেত্রে 'গুরুতর অপরাধ' বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই অপরাধ, যার সর্বোচ্চ শাস্তি ৫ বছর বা তার বেশি সময়ের কারাদণ্ড। দেশবাসী এতদিন দেখতে অভ্যস্ত ছিল যে, জেলে বসেও দুর্নীতি বা নানা অপরাধে অভিযুক্ত নেতাদের মন্ত্রীপদ বহাল থাকত। জেলে থেকেও মন্ত্রীপদে বহাল থাকা নেতারা নির্বাচনে লড়ার পথ খোলা পেত। উপরন্তু 'সিমপ্যাথি ভোট'-এর খেলা চলত। এই আইন পাশ হলে জেলে ঢুকে জামিন না পেলে তো মন্ত্রীপদটাই যে থাকবে না! তাই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরোধিতার হাওয়া বর্তমানে তুঙ্গে। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-নেত্রীরা যে তাদের দলগুলির সম্পদ, তা আবারও প্রমাণ করল ইন্ডিজোট। এই নেতাদের তাদের বড্ড প্রয়োজন। এই সংশোধনীর কোনো ধারা বা উপধারায় কিন্তু উল্লেখিত হয়নি যে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে ৩০ দিন হাজতে থাকার ফলে পদ খোয়ানো মন্ত্রী আর কখনও কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অর্থাৎ তিনি যদি সত্যিই জনপ্রিয় হোন, বা কোনো ষড়যন্ত্রের কারণে তার মন্ত্রিত্ব খোয়া গিয়ে থাকে, তবে কিন্তু জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকছে। সততা ও জনপ্রিয়তার জোরে তিনি তার গ্রহণযোগ্যতা ফের প্রমাণ করতে পারবেন। নির্বাচনে পুনরায় জয়ী হওয়ার পথ তার সামনে উন্মুক্ত থাকছে। তা না হলে ইন্দিরা গান্ধী থেকে লালুপ্রসাদ যাদব, কানিমোঝি থেকে কংগ্রেস নেতা অর্জুন সিংহ— এরকম অসংখ্য জনপ্রতিনিধি ও হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে সাজা পাওয়ার পর জেল থেকে বেরিয়ে পুনরায় জয়ী হতে পারতেন কি? ধরে নিতে হবে যে, হাজতে যাওয়ার আগে তাদের জনপ্রিয়তা ছিল। তাই নানা অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও পরবর্তী পর্যায়ে তাদের জনপ্রিয়তায় কিন্তু ভাটা পড়েনি। জেল থেকে বেরিয়েও তারা লাভ করেছেন বিপুল জনসমর্থন। তাহলে আজ রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়্‌গে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা কেন এত বিচলিত?

কংগ্রেসের বরং উচিত এই বিলকে দু'হাত তুলে সমর্থন করা। ইউপিএ-২ সরকারের আমলে ২০১৩ সালে সংসদে পাশ হয় লোকপাল বিল। সেই আইন প্রণয়নের রাজনৈতিক কৃতিত্ব তারা অহরহ দাবি করে থাকে। এক্ষেত্রে মনে করাতে হবে কংগ্রেসের আসল চরিত্র। ১৯৬৮ সালে বিশিষ্ট আইনজীবী শান্তিভূষণ প্রথম লোকপাল বিলের প্রস্তাব রেখেছিলেন। ১৯৬৯ সালে চতুর্থ লোকসভায় তা পাশ হলেও রাজ্যসভায় তা আটকে গিয়েছিল। তাই ২০১৩ সালে লোকপাল বিল পাশের বিষয়টি কোনোভাবেই কংগ্রেসি কৃতিত্ব নয়, তা এক স্বতঃস্ফূর্ত জন-আন্দোলনের ফসল। নিজের রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটিয়ে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল আজ দুর্নীতির সমুদ্র মন্থন করলেন, তিনি কিন্তু সেই সময়ে আন্না হাজারের নেতৃত্বে পরিচালিত 'জন-লোকপাল বিল' আন্দোলনের একজন সৈনিক ছিলেন। প্রশাসনিক দুর্নীতির জন্য তো কেবলমাত্র আমলা বা আধিকারিকরা দায়ী হন না। দায়ী থাকেন বিভাগীয় মন্ত্রীও। আর্থিক দুর্নীতি বা কেলেঙ্কারির যে ঘটনাগুলিকে সাধারণত 'স্ক্যাম' বলা হয়, সেই ব্যাপারগুলি হলো রাষ্ট্রবোধের পরিপন্থী। 'পাবলিক মানি' বা সরকারি অর্থ লুঠ তো নিজের দেশকেই লুঠ। কিন্তু সেই লুঠের মাধ্যমে অর্জিত বা সঞ্চিত অর্থ তো আধিকারিকরা একা উপভোগ করেন না। তাই তদন্তকারী সংস্থা কিংবা বিচারবিভাগ কান ধরে টানলে স্বাভাবিকভাবেই মাথাকেও তো আসতেই হবে। লোকপাল বিল পাশ যদি ঠিক পদক্ষেপ হয়, তবে ১৩০তম সংবিধান সংশোধনীটা তো আরও বেশি ঠিক। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তো অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত আধিকারিক তার প্রোমোশন, বেতন কাঠামো ইত্যাদি অনেক কিছুতেই নানা ধাক্কা খান। 'পাবলিক সার্ভেন্ট'-এর আইনি সংজ্ঞায় তাদের সঙ্গে তো মন্ত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত। তাহলে একজন অভিযুক্ত মন্ত্রী কেন হাজত এবং মন্ত্রীপদ দুটোই সমান্তরালভাবে ভোগ করবেন? বিরোধী জোটের দাবি হলো ৩০ দিন হাজতবাসের পর, ৩১ দিনের মাথায় অভিযুক্ত মন্ত্রী যদি জেল থেকে ফেরেন, তবে তার মন্ত্রীপদ যেন বহাল থাকে। আবারও তাকে মালা পরিয়ে, জিন্দাবাদ বলে মন্ত্রীর চেয়ারে যেন বসানো যায়। নৈতিকতাহীন, সুবিধাবাদী রাজনীতির পাঁকে নিমজ্জিত রাহুল গান্ধীদের কাছে তাদের এহেন দাবি কিন্তু মোটেই কোনো অসঙ্গত দাবি নয়। তাদের দাবির স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো যুক্তি রয়েছে কি? এটা তাদের দাবি না আবদার?

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত 'করাপশন পারসেপশন্স ইনডেক্স' বা দুর্নীতি সূচকে যখন ওপরের দিকে স্থানলাভ করে ভারত, বিশেষত এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থার চোখে দুর্নীতিতে যখন ভুটানকেও টপকে যায় আমাদের দেশ, তখন তো এই বিরোধী কণ্ঠগুলোই চেঁচামেচি শুরু করে সবার আগে। রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে তখন সবাই একমত হয় যে, দুর্নীতির পাঁকে ডুবে যাচ্ছে আমাদের দেশ। কিন্তু দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার উপায় অনুসন্ধান কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করতেই এত হইচই কেন? ২০১৪ সালে এই রাহুল গান্ধীই তো কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে বলেন যে, ছ'টি অ্যান্টি-করাপশন বিল থমকে রয়েছে। নৈতিকতার স্বঘোষিত মুখপাত্র রাহুল গান্ধী মাঝে মাঝেই বলেন— কে বা কারা আনল 'রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট'?

'জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি বিল, ২০১০' থেকে 'হুইসল্ ব্লোয়ার্স প্রোটেকশন বিল, ২০১১', 'দ্য রাইট অফ সিটিজেন্স ফর টাইম বাউন্ড ডেলিভারি অফ গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যান্ড রিড্রেসাল অফ দেয়ার গ্রিভান্সেস্ বিল, ২০১১' (বা 'সিটিজেন্স চার্টার বিল') ইত্যাদির বিষয়ে নাকি রাহুল গান্ধী সেই সময়ে সরব ছিলেন। তাহলে আজ এই সংবিধান (সংশোধনী) বিলে আপত্তি কেন? বাস্তব সত্য হলো সেদিনের লোকপাল বিলটাই ছিল কংগ্রেসের কাছে চরম অস্বস্তির। সেই বিল পাশ নিয়ে ওই সময়ে রাজনৈতিকভাবে এক বিষম অবস্থানে পড়ে কংগ্রেস। ইউপিএ-২ সরকারের পক্ষে ঠিক কতটা সমর্থন ছিল সেদিন? সংসদের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভায় ১১ ঘণ্টার

ম্যারাথন সেশন চলেছিল ২৭ ডিসেম্বর, ২০১১-র দিন। সেদিন অতক্ষণ অধিবেশন চললেও 'দ্য লোকপাল অ্যান্ড লোকায়ুক্তাজ্ বিল, ২০১১'-র পক্ষে ২৭৩টি ভোট জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-২ সরকার। স্পিকার মীরা কুমারের কাছে আবেদন গেল কিছু ধারা প্রত্যাহারের। সেদিন ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য ছিল— 'স্যাড ডে ফর ডেমোক্রেসি!' লোকসভা এই বিল অনুমোদন করলেও ২৯ ডিসেম্বর, ২০১১—এই বিল হোঁচট খায় রাজ্যসভায়। ২০১২ সালের ২১ মে পর্যালোচনার জন্য বিলটিকে রাজ্যসভার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। তখন তার মাথায় রয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সত্যব্রত চতুর্বেদী। তিনি এই বিলে বহু সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন ইত্যাদি করেন। সেদিন এই বিলকে সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি তো সমর্থন করেইনি। এমনকী নিজেদের সর্বহারার দল বলে দাবি করা বামপন্থী দলগুলিরও সমর্থন ছিল না এই বিলে। শেষ পর্যন্ত ২০১৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর পাশ হয় এই বিলটি। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি কার্যকর হয় 'দ্য লোকপাল অ্যান্ড লোকায়ুক্তাজ্ অ্যাক্ট, ২০১৩'। যারা সেদিন লোকপাল বিলের নিন্দা করেছিল, আজ তারাই সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিলের বিরোধিতা করবে, এটা হয়তো স্বাভাবিক। এই আইনটি প্রণীত হলে পরিবারতান্ত্রিক আঞ্চলিক দলগুলির একটি সমস্যা রয়েছে। এই দলগুলির শীর্ষস্থানে ক্ষমতাসীন থাকে এক-একটি পরিবার। রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দলীয় শীর্ষস্থান কুক্ষিগত রাখে এই পরিবারগুলি। বিভিন্ন রাজ্যে তারা ক্ষমতায় এলে সেই পরিবারের সদস্যরাই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে এই পরিবারতন্ত্রের বিষয়টিতে নেহরু পরিবারের যোগ রয়েছে। এই পরিবার থেকে তিনজন ব্যক্তি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কংগ্রেস দলের মূল ক্ষমতা এই পরিবারটির হাতেই কেন্দ্রীভূত। এখন কোনো আঞ্চলিক, পরিবারতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক প্রধান যদি সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থাকেন এবং কোনো গুরুতর অভিযোগে কারাবন্দি হয়ে ৩০ দিনের মধ্যে জামিন না পান, তবে এই আইনের কারণে তার মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যাবে। সেক্ষেত্রে তার পরিবারের মধ্যে থেকে কোনো রাজনৈতিক উত্তরসূরী বা উপযুক্ত কোনো বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান সেই দল না পেলে রাজ্যে সরকার ধরে রাখা তাদের কাছে অসম্ভব তো হবেই, উলটে আঞ্চলিক দলটির রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকট উপস্থিত হতে পারে।

একটা বিলের কিছু ধারা-উপধারা সংশোধন করার প্রস্তাব বিরোধীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হতেই পারে, কিন্তু অতি অবশ্যই তাতে যুক্তির ধার থাকা জরুরি। কিন্তু আইনের অপপ্রয়োগ হবে ভেবে আইনটাই তৈরি হবে না, এহেন বিরোধিতা আরও বেশি অনিয়ম ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। আইনের অপপ্রয়োগ যখনই সামনে এসেছে, তখনই সংশোধনীর মাধ্যমে তাতে উপধারা যোগ হয়েছে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে। বহুমাত্রিক দেশ ভারতে নানা মুনির নানা মত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কোনো বিষয়ে একাধিক মত বা ভিন্নমত থাকলেও তার সঙ্গে যুক্তির মেলবন্ধন হওয়া কিন্তু বাঞ্ছনীয়। লালকৃষ্ণ আদবাণীর বিরুদ্ধে যে মুহূর্তে হাওয়ালা স্ক্যামের অভিযোগ উঠেছিল, সেই মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন— 'নিড টু মেইন্টেন প্রোবিটি ইন পাবলিক লাইফ, আই রিজাইন'। ১৯৯৬-এ তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠলে তিনি তখনই সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন। তিনি পরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করলেন না। দলীয় কোনো পদেও থাকলেন না।

২০১৬-তেও ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা এবং মহারাষ্ট্র সরকারের মন্ত্রী একনাথ খড়সে তাঁর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি অভিযোগ উঠতেই পদ ছাড়েন। দুর্নীতির অভিযোগ আসতেই তাঁদের পদ ছাড়ার বিষয়টিকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে কিন্তু এই উদাহরণগুলির তুলে ধরা হচ্ছে না। কারণ তা কখনোই কোনো গৌরবের পর্ব নয়। কিন্তু গুরুতর অভিযোগ উঠলে পদ ছাড়াটা বাধ্যতামূলক করলে আশা করা যায় যে, দেশজুড়ে দুর্নীতি বা অপরাধমূলক কাজ কমবে। এই সংবিধান সংশোধনী আইনটির একটি 'ডেটারেন্ট এফেক্ট' রয়েছে। পদ যেতে পারে এই ভয় তখনই কাজ করে যখন নৈতিকতায় ভক্তি থাকে না। নীচে 'সত্যমেব জয়তে' বাণীটি সংবলিত অশোক স্তম্ভ হলো ভারতের জাতীয় প্রতীক। সেখানে মুণ্ডক উপনিষদ হতে সংগৃহীত এই বাণীটি খোদিত থাকার পরও যখন এমন বিল পেশ করার দরকার পড়ে, তখন এটা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে, সরকার বা প্রশাসনের অনেক উচ্চস্তরে দুর্নীতি এবং নানা অপরাধ সংঘটিত হয়। দেশে ও সমাজে দুর্নীতি তখনই মাত্রাছাড়া হয়, যখন গণতান্ত্রিক পরিসর ধ্বংস হতে থাকে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রিত হলে দেশের গণতন্ত্র মজবুত হয়। দুর্নীতি দমন এবং দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় এইরকম শক্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে কী নেই, এই পদক্ষেপ ঠিক নাকি ভুল— সেই বিষয়ে দেশবাসীর কী মত তা জানতে পশ্চিমি দেশগুলির কায়দায় একটি অনলাইন রেফারেন্ডাম আয়োজিত হলে দেখা যাবে সাধারণ মানুষ হইহই করে এই আইনকে সমর্থন করবে। কারণ রাহুল গান্ধী বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্তদের বাড়ির লোকজন বাদে বাকি সব মানুষ তো প্রতিনিয়ত সরকারি দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অনিয়মের শিকার হন। তাই কিছু মুষ্টিমেয় লোকজন বাদে সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিলে ১০০ শতাংশ সমর্থন দেবে দেশের সকলেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধ শেষ হলে কফিন কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজের বিরুদ্ধে। ২০০১ সালে সেই প্রতিবাদে ক্যাবিনেট সদস্যপদ ছেঁড়া চপ্পলের মতো নাকি ফেলে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আজ কেন এই বিলের প্রতি ধিক্কার? তিনি কি 'সততার প্রতীক' সেজেছিলেন বা সাজার চেষ্টা করেছিলেন সেদিন?

গণতন্ত্রে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থাকবেই। তাই প্রতিবাদটা থাক। বরং আরও বেশি বেশি করে প্রতিবাদ হোক। যে প্রতিবাদে নিজেদের দুর্বলতাটাই প্রমাণ হয়, তা রাজনীতিতে হয়তো তেমন একটা লাভজনক নয়। □

ঘুষ বা আর্থিক সাহায্য নেওয়া কংগ্রেসিদের কাছে জলভাত

মণীন্দ্রনাথ সাহা

অনেকেই বলেন, সরকারের পুলিশ ও প্রশাসনের লোকেরা ঘুষ খান। কেননা, ঘুষ পেলে তাঁরা নাকি তাড়াতাড়ি কাজ করে দেন। কেউ কেউ আবার বলেন, শুধু পুলিশ আর সরকারি কর্মীরাই ঘুষ খান না, বহু রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাও তো ঘুষ খান। তবে সেসব ক্ষেত্রে ঘুষ কথাটা ব্যবহার হয় না। তা ব্যবহার হয় কোথাও কাটমানি, কোথাও উপহার, কোথাও-বা আর্থিক সাহায্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়। যাইহোক, এই ঘুষ নিয়েই এবার ঘষামাজা শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি একটা সংবাদে জানা গিয়েছে যে, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে কংগ্রেস সম্পর্কে এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক উস্‌কে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অভিযোগের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন ২০১১ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র প্রকাশিত একটি ডি-ক্লাসিফায়েড নথি।

নিশিকান্ত দুবে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সিআইএ-র একটি পুরানো রিপোর্ট তুলে ধরে দাবি করেছেন যে— ১৯৮০-র দশকে কংগ্রেস সরকারের আমলে রুশ গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি ভারতে কার্যত অবাধে চলাফেরা করত। এতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের নীরব মদত ছিল। নিশিকান্তবাবু আরও দাবি করেছেন— 'সিআইএ ২০১১ সালে একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, প্রাক্তন সাংসদ হরিকৃষ্ণ লাল ভগত-সহ প্রায় ১৫০ জন কংগ্রেস সাংসদ সোভিয়েত রাশিয়ার থেকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পেতেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, নিশিকান্ত দুবের দাবি মতো শুধুমাত্র ১৫০ জন কংগ্রেস সাংসদ আর্থিক সাহায্য নিয়েছেন? তা তো নয়। ১৯৭০-র দশকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও কেজিবি-র কাছ থেকে সাহায্য নিতেন। যদি তা না নেন, তবে তাঁর বাড়িতে সুটকেস ভর্তি কোন কোন জিনিস যেত?

দশ-এগারো বছর আগে ইন্দিরা গান্ধীর কেলেঙ্কারি নিয়ে একটি বইতে বলা হয়েছে— 'সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধীর বাড়িতে যেত সুটকেস ভর্তি টাকা। টাকা পাঠাত কেজিবি।' এটা কিন্তু কোনো সাধারণ মানুষের অভিযোগ নয় বা নয় কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের রং চড়ানো কথা। একথা ব্রিটিশ অধ্যাপক ক্রিস্টোফার অ্যান্ড্রু এবং প্রাক্তন কেজিবি কর্মী ভ্যাসিলি মিত্রোখিনের। তাঁদের লেখা 'দ্য মিত্রোখিন আর্কাইভ, ভল্যুম ২ : দ্য কেজিবি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' নামের বইতে তাঁরা এই বিষয়ে লিখেছেন।

শুধু তাই নয়, সেই সময় কেজিবি-র বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কর্তা স্বীকার করেছেন, ভারতে জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরাকে সমর্থন করার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকেও (সিপিআই) প্রভাবিত করেছিল কেজিবি। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে ইন্দিরা গান্ধী দিল্লির ক্ষমতা দখলের পর থেকেই তাঁকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে অনেক বেশি তৎপর হয়ে ওঠে ক্রেমলিন। সেসময় সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বময় কর্তা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি লিওনিদ ব্রেজনেভ।

এছাড়া ২০২৫ সালের সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজে আর একটি চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হয়েছিল। সেটি হলো— 'কেজিবি-র প্রাক্তন গোয়েন্দা ভ্যাসিলি মিত্রোখিন এবং ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার অ্যান্ড্রুর লেখা বিতর্কিত বইটির ৩১৩ নং পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছিল--- কেজিবি-র রিপোর্ট অনুসারে প্রয়াত সিপিএম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯৪৭ সাল থেকেই কেজিবি-র চর বা ইনফরমার হিসেবে কাজ করেছিলেন।'

এই খবরে একটি বিষয় প্রমাণ হচ্ছে যে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্যে লোক দেখানো বিরোধিতা থাকলেও ওই দলদুটো প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করে এসেছে এবং এখন তো উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্যে মাখো মাখো সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে।

নিশিকান্ত দুবের দাবি মতো কংগ্রেস সাংসদদের আর্থিক সাহায্য নেওয়াই হোক বা ঘুষ নেওয়া হোক, সেটি শুরু হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে, সেনাবাহিনীর জন্য জিপ কেনার মধ্যে দিয়ে। তারপরে ইন্দিরা গান্ধীর বাড়িতে সুটকেস ভর্তি টাকা হয়ে রাজীব গান্ধীর বোফর্স কেলেঙ্কারি এবং তার পরবর্তীতে রাজীব পত্নী সোনিয়া মাইনো এবং তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ওঠা কংগ্রেস দলের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'হেরাল্ড'-এর সম্পত্তি নয়-ছয় করার দায়ে আদালতের দয়ায় আইনের নজরে জামিনে রয়েছেন তারা। অর্থাৎ এহেন চৌর্যবৃত্তির পারিবারিক ঐতিহ্য বহন করা একটি দল বলে কংগ্রেসকে অনেকেই মনে করেন।

এখন কথা হলো রাজনৈতিক নেতা বা সাংসদ-বিধায়করা যদি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ঘুষ নিয়ে থাকেন কিংবা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করেন তাহলে এখন আর কেউ এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান না। অনেকেই মনে করেন এটি তাদের হকের ধন। ঠিক এই কারণেই বহুদিন আগে বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার' নামক বিখ্যাত উপন্যাসে একটি চরিত্রের মুখে একজন পার্লামেন্ট সদস্যের মনের কথাটি সুন্দর ভাবে বলিয়েছেন। যেমন 'What is the fun of being Member of Parliament if you must pay back your debt?' অর্থাৎ ধার শোধ করতেই যদি হয় তাহলে পার্লামেন্ট সদস্য হবার মূল্য কী রইল! একেবারে মোক্ষম কথা, বিশেষত আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। এমপি, এমএলএ-দের মনের কথা যেন শতবর্ষ পূর্বেই অনুমান করেছিলেন দূরদর্শী লেখক থ্যাকারে।

কাজেই নেহরু তথা গান্ধী পরিবারের প্রত্যেকে যেখানে চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত, সেখানে সেই দলের কিছু সংখ্যক সাংসদের আর্থিক সাহায্য নেওয়া এমন কিছু দোষের মধ্যে পড়ে না বলেই জনসাধারণের বিশ্বাস।

এক মহাযোগীর জীবনকথা

সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ঈশ্বরপ্রেরিত সাধকেরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে এই ভূমিকে আরও পবিত্র করেছেন। ভারতবর্ষের সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন সর্বক্ষেত্রেই সাধক তথা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই পথপ্রদর্শক। সংসার জীবনে আবদ্ধ মানুষ শান্তিলাভের আশায় সাধু সন্ন্যাসীদেরই জীবনের ধ্রুবতারা করেছে । এই ভারতবর্ষে কত মত-পথ, কত ধারার সাধক ও সাধু-সন্ন্যাসী রয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সকলেরই লক্ষ্য মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করে সৎপথে চালিত করা। তাঁরা যে কত প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করে মানব সেবায় রত আছেন তারও ইয়ত্তা নেই। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এরকম একটি আধ্যাত্মিক- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সেবা, স্বাবলম্বন, শিক্ষা ও সংস্কার দানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য জাতিগঠন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ মানুষের মধ্যে আধ্যত্মিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতিগঠনের মহান কাজটিও শুরু করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে আধ্যাত্মিক পুরুষদের মধ্যে তাঁকেই হিন্দুজাতির রক্ষাকর্তা নামে অভিহিত করা যায়। তাঁকে রুদ্রাবতার বলা হয়ে থাকে। জাতি ও ধর্ম রক্ষার কাজটিকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা আজও গুরুমহারাজের সেই ধারা বহন করে চলেছেন। ভারতভূমির মানুষ গুরুমহারাজের মধ্যে ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রতেজের অপূর্ব সম্মিলন দেখেছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দীক্ষিত ভক্ত, অনুগামী, এমনকী সাধারণ মানুষের মনে বহুদিন একটি জিজ্ঞাসা ছিল যে, এমন যে তেজস্বী গুরুমহারাজ তাঁর গুরুদেবের জীবন ও সাধনা কেমন ছিল? শ্রীগুরু মহারাজের জীবনীমূলক যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায় তাতে

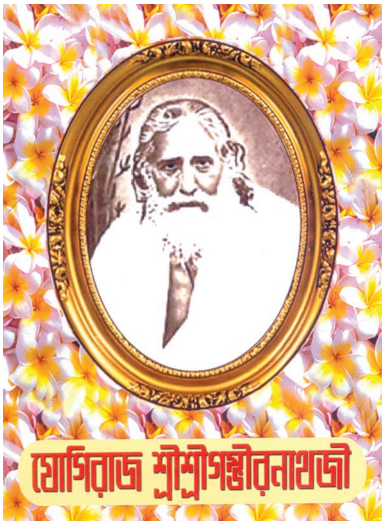

শুধু এটুকু বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি ১৯১৩ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে তাঁর এক শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে কাশীতে গিয়ে গোরক্ষপুরের মহাযোগী বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর কোনো জীবনীমূলক গ্রন্থ না থাকায় ভক্তদের সেই সংক্রান্ত বিষয়ে জানার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যায়।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী তথা প্রণব পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজ। তিনি এবছরই 'যোগিরাজ শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজী' নামে এক দুর্লভ গ্রন্থ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভক্ত, অনুগামী এবং সাধারণ পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক অতি বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, মহাসাধক শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজীর ইচ্ছাতেই তিনি এই কর্মটি সম্পাদন করতে পেরেছেন। ২০২১ সালে হাওড়ার শিবপুর নিবাসী শ্রীবরুণ কুমার নাথ বাবা গম্ভীরনাথজীর বিশেষ স্নেহধন্য অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি বহু পুরনো পুস্তকের ফোটোকপি (জেরক্স) স্বামী যুক্তানন্দজীর হাতে দিয়ে পড়ার অনুরোধ করেন। স্বামীজী মহারাজ সেই পুস্তক পড়তে পড়তে পুলকিত বোধ করেছেন। তাকে বাবা গম্ভীরনাথজীর কৃপা মনে করেছেন। তারপর সেই গ্রন্থের মূল ভাব ও বক্তব্য অবিকৃত রেখে সহজ, সরল এবং সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র প্রণব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছেন। তারপর এবছরই পুস্তকাকারে তা পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

গ্রন্থটিতে মহাযোগী বাবা গম্ভীরনাথজীর জীবন ও সাধনা প্রাঞ্জলভাষায় উপস্থান করার সঙ্গে নাথ পরম্পরার ইতিহাসও সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও সাধক জীবন, সাধনার বিভিন্ন ক্রম, মহাপুরুষের শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি বহু বিষয় স্থান পেয়েছে যা যেকোনো পাঠককে নিশ্চিতভাবে ঋদ্ধ করতে পারে।

গ্রন্থের শেষপর্যায়ে বাবা গম্ভীরনাথজীর কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্যের স্মৃতিকথা এই মহাসাধকের জীবন ও সাধনাকে উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। একেবারে শেষভাগে 'শ্রীগুরু যোগিরাজ শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজীর প্রসঙ্গে শিষ্য স্বামী প্রণবানন্দজী—' সংযোজনটি গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বাবা গম্ভীরনাথজীর চিত্র সংবলিত ২১২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ভারতের সাধক মালিকায় আরও একটি পুষ্প সংযোজিত হলো— একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাঠকদের হাতে একরকম একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তুলে দেওয়ার জন্য স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজকে অসংখ্য প্রণাম।

পুস্তকের নাম ঃ যোগিরাজ শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজী। লেখক : স্বামী যুক্তানন্দ। প্রাপ্তিস্থান ঃ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ। বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯।
প্রণামী : ১৫০.০০

সবচেয়ে বড়ো ভালো কাজ

বাবার তখন খুব বয়স হয়ে গিয়েছিল। হাঁটার সময় টলমল করতেন। সেজন্য তিনি দেওয়াল ধরে ধরে বাথরুমে যেতেন বা খাবার টেবিলে আসতেন। বারবার দেওয়াল ধরে চলার ফলে দেওয়ালে দাগ পড়ে যেত। রং দিয়ে ঘসে দিলেও তাঁর হাতের দাগ অস্পষ্ট দেখা যেত।

আমার স্ত্রী রাগতস্বরে প্রায়ই বলত, দেওয়াল নোংরা হয়ে যাচ্ছে, কিছু তো করো! আমি চুপ করে থাকতাম।

একবার বাবা মাথাব্যথার কারণে নিজে নিজেই মাথায় একগাদা তেল লাগিয়েছিলেন। সেদিন দেওয়াল ধরে চলার সময় দেওয়ালে তেলের দাগ লেগে যায়। আমার স্ত্রী সেদিন খুব রেগে গিয়ে আমাকে বলল, সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আর কিন্তু সহ্য করা যাচ্ছে না।

রাগের মাথায় আমিও বাবাকে খুব বকেছিলাম। বলেছিলাম, তুমি দেওয়ালে হাত দেবে না। দেওয়াল না ধরেই চলার চেষ্টা করো।

আমার কথাগুলি তাঁর মনে খুব আঘাত করেছিল। তিনি একেবোরে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চেখে-মুখে গভীর বেদার ছাপ দেখা গিয়েছিল। সেদিনের পর থেকে তিনি দেওয়াল ধরে চলা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। একদিন তিনি টলমল করতে করতে পড়ে গেলেন। কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর আর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিই ছিল না। তার কয়েক মাস পরেই তিনি চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

এক ভীষণ অপরাধবোধ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মনে

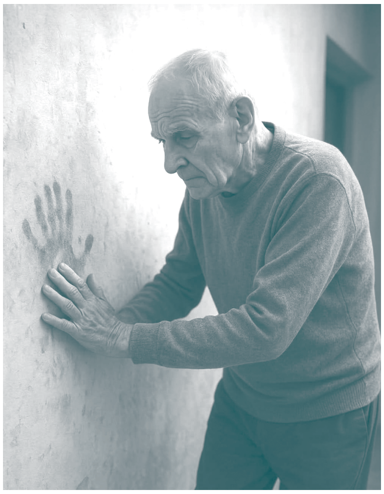

হচ্ছিল সেদিন যদি আমি এত কঠোর শব্দ তাঁকে না বলতাম তাহলে তিনি আরও কিছুদিন আমাদের কাছে থাকতেন।

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। বাড়িঘরে রঙের কাজ শুরু হয়েছে। আমার ছেলে পেন্টারকে বলল, দেওয়ালে আঙ্গুলের ছাপগুলো মেটাবে না। ওগুলো আমার ঠাকুরদার স্মৃতিচিহ্ন।

একথা শুনে আমার চোখ ছলছল করে উঠল। পেন্টার বলল, এই দাগগুলো আমি আরও ভালোভারে সাজিয়ে দেবো। সত্যি সত্যি পেন্টার আমার বাবার হাতের ছাপগুলোকে এক সুন্দর ডিজাইনের রূপ দিয়ে দিল। ধীরে ধীরে দেওয়ালটি আমাদের কাছে এক আবেগের স্থান হয়ে উঠল। বাড়িতে আসা আত্মীয়স্বজন, অতিথি অভ্যাগতরা বলতে লাগল, এ তো হৃদয় স্পর্শ করা শিল্প।

সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে আমিও এক সময় বুড়ো হয়ে গেলাম। পায়ে শক্তি নেই। চলার সময় দেওয়ালের সাহায্য নিতে হয়। একদিন মনে পড়ল আমি বাবাকে কী বলেছিলাম। মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হওয়ায় সেদিন দেওয়াল না ধরেই চলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তখনই আমার ছেলে দৌড়ে আমার কাছে এসে গেল আর বলল, বাবা, দেওয়াল ধরো, না হলে পড়ে যাবে!

ছেলের কথা শুনে আমার দুচোখ জলে ভরে এলো। তখনই আমার নাতি ছোটো ছোটো পায়ে এসে আদুরে গলায় বলল, দাদু, দেওয়াল ধরতে হবে না, আমাকে ধরো।

আমি কাঁপতে কাঁপতে নাতির কাঁধে হাত রাখলাম। ও আমাকে ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিয়ে দৌড়ে ঘরে গেল। তার সরলতায় আমার দুচোখ জলে ভরে উঠল। একটু পরে ঘর থেকে একটি ড্রইং খাতা নিয়ে এসে আমার সামনে মেলে ধরল। দেখলাম, দেওয়ালে আমার বাবার হাতের যে ছাপ রয়েছে তার ছবি আঁকা। তার নীচে লেখা—‘ছোটোরা যদি তাদের বড়োদের আশ্রয়স্থল হয়, তাহলে কোনো মানুষ বৃদ্ধবয়সে একাকিত্ব অনুভব করবে না।’

বাবার কথা মনে হওয়ায় আমি ভেতরে ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগলাম আর বারবার বাবার উদ্দেশ্যে ক্ষমা চাইতে লাগলাম।

ছোটো বন্ধুরা, সময় কিন্তু কাউকে ক্ষমা করে না। আজ যে ছোটো, সেও একদিন বৃদ্ধ হবে, আর তাকেও এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তাই বড়োদের সম্মান করো, তাদের কষ্ট অনুভব করো। মনে রেখো, বড়োদের অবলম্বল হওয়াই সবচেয়ে বড়ো ভালো কাজ।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

বেতলা

বেতলা জাতীয় উদ্যান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের লাতেহার ও পালামু জেলার ছোটনাগপুর মালভূমিতে অবস্থিত। এটি রাজ্যের একমাত্র উদ্যান। ২২৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ১৯৬৮ সালে একে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়েছে। এটি পালামু টাইগার রিজার্ভের একটি অংশ। এই উদ্যানে শালগাছ ও বাঁশের আধিক্য রয়েছে। বন্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে চিতল, সম্বর, গৌড়, হাতি, নীলগাই, চিতাবাঘ, বাঘ, হায়না, বন্য শুয়োর, নেকড়ে, বিভিন্ন রকমের বাঁদর, বনবেড়াল চারশিঙের হরিণ ইত্যাদি। পাখির মধ্যে রয়েছে ধনেশ, ময়ূর, কালো তিতির, সাদাগলা সারস, ঈগল, পেঁচা, হরিয়াল, ঘুঘু ইত্যাদি। এই উদ্যান মেদিনীপুর থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এখানে সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। তবে নভেম্বর থেকে এপ্রিল ভ্রমণের উপযুক্ত সময়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮৪

क्रियापदस्य उत्तमपुरुषे बहुवचनम्
पठामि-पठाम।
(আমি) পড়ি-- (আমরা) পড়ি।
अहं पठामि। वयं पठामः।
अहं लिखामि। वयं लिखामः।
अहं हसामि। वयं हसामः।
अहं पिबामि। वयं पिबामः।
अहं चलामि। वयं चलामः।
अहं वदामि। वयं वदामः।
....। ... .।
प्रयोगं कुर्मः -
स्वयं वाक्यानि वदामः।
गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, पिबति, वदति, पश्यति, गायति,वदति,पश्यति, नृत्यति, धावति, पृच्छति, क्रीडति, उपविशति।

ভালো কথা

চড়াইছানা

একমাস আগে আমার ছোটো কাকা রাস্তায় একটি চড়াইপাখির ছানা কুড়িয়ে পয়েছিল। তখন ছানাটির সবে কালো কালো পালক দেখা যাচ্ছিল। ছানাটিকে কাকিমা ছাতু গুলে খাওয়ানো শুরু করে। তারপর সাতদিনেই ওর পালক গজিয়ে যায়। পনেরো দিনে ছানাটি উড়তে শেখে। কিন্তু ছানাটি উড়ে গিয়ে এদিকে-ওদিকে বসলেও আবার কাকিমার কাঁধে এসে বসে। কাকিমাকে ছাড়া ওটা থাকতেই চায় না। রাত্রিবেলা কাকিমার ঘরে আয়নাটার উপর বসে থাকে। আমি কাকিমার কাছে গেলেই ওটা আমার মাথায় বসে ঠোকরাতে থাকে আর চিঁ চিঁ করতে থাকে। তবে এখন আমার মাথাতেও এসে বসে। আমার সঙ্গেও ওর ভাব হয়ে গেছে। আমরা খেতে বসলে ওকে আগে কয়েকটি ভাত দিতে হয়। ও ওগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে খায়।

শ্যামলী মহান্তি, সপ্তমশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ছোটো ভাই

বৈশালী চক্রবর্তী, পঞ্চমশ্রেণী, রানাঘাট , নদীয়া।

আমার ছোটো ভাই
বলে শুধু তাই তাই।
পড়াশোনা কিছু নাই
খিদে পেলে খায় মাই।
আমাকে বলে দিদি দিদি
আমি তখন আদর করি
কোলে নিলে কান্নাকাটি
হয়ে যায় দিনটি মাটি।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

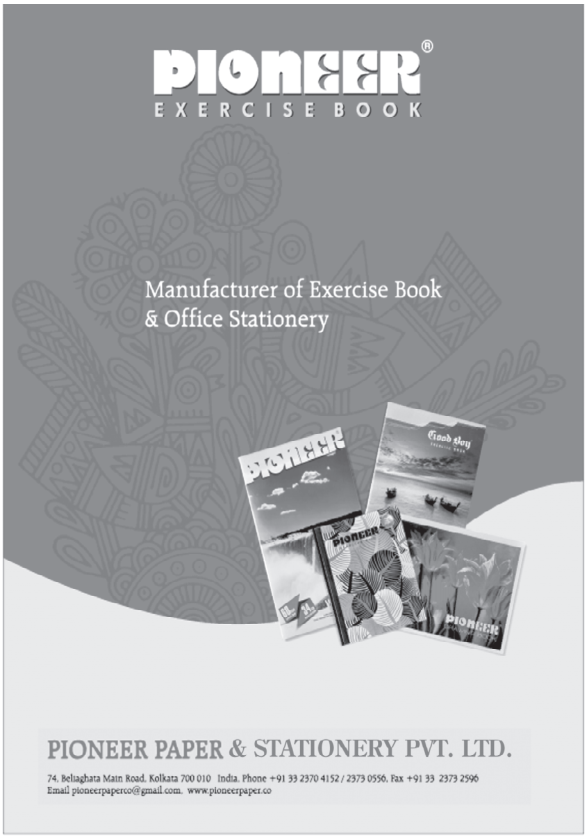

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

‘বেঙ্গল ফাইলস্’ মুভি হিসেবে হয়তো এতে ততটা ক্লাইম্যাক্স নেই, কিন্তু এটি ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়, যা এতদিন আপনাকে জানানো হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বাঘা বাঘা চিত্র পরিচালক-প্রযোজক ছিলেন, আছেন, তারা কিন্তু এমন ছবিতে হাত দেননি। দিয়েছেন একজন অবাঙ্গালি— বিবেক অগ্নিহোত্রী।

‘বেঙ্গল ফাইলস্’ বঙ্গের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়কে নতুন করে তুলে ধরেছে

শিতাংশু গুহ

‘বেঙ্গল ফাইলস্’ দেখলাম। সাড়ে তিনঘণ্টা একটানা ঠায় বসে সিনেমা দেখা, কোনো সাড়াশব্দ নেই, কথা নেই, শুধু দেখা ও শোনা, উপলব্ধি করা। বুঝতে চেষ্টা করা কী ঘটেছিল ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে’ অথবা নোয়াখালিতে লক্ষ্মীপূজার দিন? এ ছবি যে কারও অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো। এই প্রতিবেদক কাশ্মীর ফাইলস্, কেরালা স্টোরিও দেখেছে। সেগুলো ছিল একটু দূরের চিত্র, ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস্’ বাঙ্গালির ঘরের ঘটনা। হলে বসে বসেই ভাবছিলাম, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের হিন্দুর জন্যে তো প্রতিদিনই ‘নোয়াখালি’; কলকাতার হিন্দু কী আবার ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে’ দেখবে? মমতা ব্যানার্জি আরও কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলে দেখবে বটে! বলে রাখা ভালো, আমি ‘সিনে-ক্রিটিক’ নই, আমি শুধু যা দেখেছি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। ‘বেঙ্গল ফাইলস্’-এর সবাই ভালো অভিনয় করেছেন।

মুভিটি দেখতে দেখতে এই প্রতিবেদকের মনে হচ্ছিলো, বিবেক অগ্নিহোত্রী কি লজ্জা পাচ্ছিলেন আরও সত্যি ঘটনাগুলো আরও পরিষ্কারভাবে দেখাতে? যেটুকু দেখিয়েছেন, তা হয়তো শিহরণ জাগায়, বাস্তবতা কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশি নির্মম, কদর্য, কুৎসিত। বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রায়শই বলি— ‘স্ট্যান্ড আপ হিন্দুজ’; ‘বেঙ্গল ফাইলস্’ দেখিয়েছে পালিয়ে বাঁচা যায় না, গোপাল মুখার্জি ও কাশ্মীরি যুবক প্রতিরোধ গড়ে তুললো, প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, হিন্দু বাঁচলো। সুরাবর্দি বলতে বাধ্য হলো— যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে, হিন্দু জেগেছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। হ্যাঁ, হিন্দু জাগলে, ঐক্যবদ্ধ হলে জেহাদি শক্তি পরাভূত হতে বাধ্য। সুরাবর্দি হেরেছেন, তিনি ‘কলকাতার কসাই’ খেতাব পেয়েছেন।

মরতে মরতে হিন্দু জিতেছে, গোপাল মুখার্জি সেদিন হিন্দুদের

ফঃ ৬

জিতিয়ে দিয়েছে। সেদিন হিন্দু হারলে পুরো বঙ্গ পাকিস্তানে চলে যেত। নোয়াখালিতে হিন্দু ছিল মাত্র ২০ শতাংশ, প্রবল সংখ্যাধিক্যে জেহাদিরা নৃশংসতা চালিয়ে বিজয়ী হয়, নোয়াখালি পাকিস্তানে চলে যায়। নোয়াখালিতে কত হিন্দু নিহত হয়েছিল, কত রমণী ধর্ষিতা বা বাধ্যতামূলক ধর্মান্তরিত হয়েছিল তা গুগল্ ঘাঁটলে জানা যাবে। ভাবছিলাম যে, কলকাতায় এক সপ্তাহের কম সময়ে ৪০ হাজার মানুষ মারা গেল, তখন কলকাতার জনসংখ্যা কত ছিল? আরও ভাবছিলাম, ১৯৪৬ থেকে ২০২৫, ওরা কি মানুষ হয়েছে?

না, হয়নি। পাকিস্তান, বাংলাদেশ তা বলছে না। মুর্শিদাবাদ, কাশ্মীর, আইএস, আল-কায়েদা, জামাত, হরকাতুল জেহাদ সেই সাক্ষী দেয় না। ওরা বদলায় না, সংখ্যালঘু হলে ওরা সুবোধ বালক, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী। সংখ্যা বাড়লে, ক্ষমতায় থাকলে ওদের আসল ভয়ংকর রূপ প্রকাশ পায়। 'বেঙ্গল ফাইলস্'-এর ডায়লগ— 'কাফেরের বাঁচার অধিকার নেই।' এটা কোনো মিথ্যাচার নয়, বাস্তবতা। আপনি যতই 'রাখি' পড়ান না কেন, যতই বলুন না কেন, 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই'— ওরা তা বলে না, মানে না। ইসলাম মানলে বিধর্মীরা ভাই হতে পারে না, এটাই সত্য। জিন্না তো পরিষ্কার বলেছেন, হিন্দু-মুসলমান দুটি ভিন্ন জাতি। 'বেঙ্গল ফাইলস্' ফিল্ম নয়, এটি বাস্তবতা। এটি বর্তমান দর্শকদের জন্যে তো বটেই, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও।

গান্ধী-জিন্নার কথাবার্তা শুনুন : গান্ধী বলেছেন, 'আরবের মুসলমান আর ভারতের মুসলমান এক নয়। ভারতের মুসলমান হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত, ধর্ম ভিন্ন হলেও সংস্কৃতি ভারতীয়। জিন্নার স্পষ্ট উত্তর, না, তোমাদের বহু ঈশ্বর, আমাদের এক আল্লা। তোমাদের বেদ-গীতা, আমাদের কোরান। তোমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি, আমাদের আরবি সংস্কৃতি।' তাই ওদের পক্ষে বাঙ্গালি বা ভারতীয় হওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুরা যত তাড়াতাড়ি এটি বুঝতে পারবে ততই হিন্দু-মুসলমানের মঙ্গল। 'বেঙ্গল ফাইলস্' বিনোদন নয় যে গিয়ে নাচগান দেখবেন। এটি আপনার অতীত, এক নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্র। এ ছবি দেখে শিখুন, জানুন, ভাবুন আপনার সন্তান, নাতিপুতির ভবিষ্যৎ কী?

ভাবুন, 'বেঙ্গল ফাইলস্' তো পাকিস্তান বা বাংলাদেশে রিলিজ হয়নি, আর রিলিজ হয়নি পশ্চিমবঙ্গে। এর অর্থ কী? কেউ হয়তো বলবেন রাজ্য সরকার তো নিষিদ্ধ করেনি। তা করেনি, কারণ মমতা ব্যানার্জি দুধেল গাইদের যা বলার বলে দিয়েছেন, এতে হিন্দু ব্যবসায়ীরা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে। এই যে ভয়, এই ভয় দেখিয়েই আরব দস্যুরা আটশো বছর ভারত শাসন করেছে, ভয়াবহ অত্যাচার করেছে। ভয়কে জয় করে বেরুতে না পারলে বাঙ্গালি হিন্দুর কপালে আরও 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান' রয়েছে। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লিগ ডাইরেক্ট অ্যাকশানের মাধ্যমে যে হিন্দু জেনোসাইড শুরু করেছে তা কিন্তু চলমান। পাকিস্তান-বাংলাদেশে তীব্রভাবে, ভারতে ধীরভাবে। হলে বসেই ভাবছিলাম, দাঙ্গা ঘটালো মুসলিম লিগ, তৃণমূল কেন এ মুভির বিরোধিতা করছে? ১৯৪৬ -এর মুসলিম লিগ আর ২০২৫-এর তৃণমূল কি একই আদর্শের রাজনীতি করে?

'বেঙ্গল ফাইলস্' মুভি হিসেবে হয়তো এতে ততটা ক্লাইম্যাক্স নেই, কিন্তু এটি ইতিহাসের কালো অধ্যায়, যা এতদিন আপনাকে জানানো হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বাঘা বাঘা চিত্র পরিচালক-প্রযোজক ছিলেন, আছেন, তারা কিন্তু এমন ছবিতে হাত দেননি। দিয়েছেন একজন অবাঙ্গালি— বিবেক অগ্নিহোত্রী। 'বেঙ্গল ফাইলস্' মুভির পাশে দাঁড়ান, কারণ আজও যারা মুঘলের দাসত্ব করছে, তারা চায়নি এটি মুক্তি পাক, তারা চায় না বাঙ্গালি সত্যটা জানুক। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, 'বেঙ্গল ফাইলস্' ভালো ব্যবসা পাচ্ছে না, বাঙ্গালির মুভি পশ্চিমবঙ্গে দেখানো না হলে ব্যবসা হবে কোথায়? বিতর্ক সৃষ্টি হলেও এটি অর্থনৈতিকভাবে পরিপূর্ণ সাফল্য না পাওয়ার আর একটি কারণ হয়তো চিত্রনাট্য ততটা নির্মম ছিল না। সিমরত কাউর ও মিঠুন চক্রবর্তীর উপস্থিতি কিছুটা কমিয়ে নোয়াখালির বীভৎসতা একটু বেশি দেখানো যেত।

'বেঙ্গল ফাইলস্' হলো প্রাক্-বিভাজন পর্বে হিন্দু গণহত্যা চ্যাপ্টার নতুন করে উন্মোচন। এটি বাঙ্গালি হিন্দুর চোখ খুলে দেবে। এটি একটি অন্ধকার চ্যাপ্টার আলোতে নিয়ে আসা। ভারতীয় বাবা বিচারপতি ব্যানার্জি ও গুলামের মধ্যেকার ডায়ালগগুলো হিন্দুদের মনে রাখা দরকার। কারণ গুলাম যা বলেছে, 'যেমন একজন কাফের কখনোই মুসলমানের সমান হতে পারে না, অথবা কাফেরদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।' এগুলো মাদ্রাসায় শেখানো হয়। 'বেঙ্গল ফাইলস্' দেখবেন যাতে এ নির্মমতা আর কখনো না ঘটে। এ থেকে শেখার আছে। মুভিতে বলা হচ্ছে, 'ভারত ভাগ শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালে, এটি শেষ হয়নি, এটি চলছে, চলবে'— এ বক্তব্য মিথ্যা নয়। প্রমাণ কি দেখতে পাচ্ছেন না? তবে ১৯৪৬-এ পুলিশের ভূমিকার সঙ্গে আজকের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের চরিত্রটা হুবহু মিলে গিয়েছে।

সবাই মিঠুন চক্রবর্তী, সিমরত কাউর, অনুপম খের-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আমি কিন্তু এঁদের সঙ্গে সিবিআই অফিসার দর্শন কুমারের অভিনয়ে মুগ্ধ। জিন্নার ভূমিকায় রাজেশ খেরা চমৎকার অভিনয় করেছেন, ভারতীয়দের উচিত জিন্নার কথাগুলো মনে রাখা। ভারতী ব্যানার্জির ভূমিকায় সিমরত কাউর সুযোগ পেয়েও সর্দার হুসেনের বুকে ছুরি মারতে পারেনি, দর্শন কুমার কিন্তু গুলামকে ছেড়ে দেয়নি। ভারতে মুসলমান আগ্রাসনের ইতিহাস দেখলে বুঝবেন হিন্দু রাজাদের অতিমাত্রায় 'উদারতা' যা মূলত দুর্বলতা, সেটিই ভারতকে পরাধীন হতে সহায়তা করেছে। গুলামরা কিন্তু ভুল করেনি, প্রথম সুযোগেই নোয়াখালির জমিদার রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে পিছপা হয়নি। ইসলামিক র‍্যাডিক্যাল গুলাম সারোয়ার হুসেইন-এর ভূমিকায় নমশি চক্রবর্তী ভালো অভিনয় করেছেন, তিনি যে মিঠুন চক্রবর্তীর পুত্র তা জানতাম না। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক বাঙ্গালি হিন্দুর মুভিটি যেকোনো ভাবে দেখা উচিত। □

পশ্চিমবঙ্গেও শুরু এসআইআর-এর প্রস্তুতি সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের শাসকদল

বুথ এলাকায় প্রবীণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে, যাঁদের নির্দিষ্ট এলাকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রয়েছে। যাঁরা জানেন, কোন পরিবারের কে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, মারাই বা গিয়েছেন কে। তার ফলে সমীক্ষার কাজ হবে মসৃণ। তবে ভোটার সমীক্ষার মূল কাজটি কিন্তু করতে হবে বিএলওদেরই।

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

কাঠি পড়ে গেল এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)-এর ঢাকে। গত ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে আয়োজন করা হয় চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার্স কনফারেন্সের। এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন দেশের সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনাররা। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এই কনফারেন্সে দেশজুড়ে এসআইআরের কাজ শুরু করার বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্যগুলির সিইওদের সম্যক ভাবে অবহিত করা হয়। কনফারেন্সের পরের দিনই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

এসআইআরের লক্ষ্যই হলো ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করা। এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর কারণ বিশ্লেষণ করার আগে জেনে নেওয়া যাক এসআইআর ঠিক কী?

নির্দিষ্ট সময় অন্তর এসআইআর করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দেশে শেষবার এই সমীক্ষা হয়েছিল ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে। ভোটার তালিকায় থাকা নামের মধ্যে কারা মৃত, অন্যত্রই বা চলে গিয়েছেন কারা, ভুয়ো ভোটারই-বা কারা— এ সবই নিবিড়ভাবে সমীক্ষা করে কমিশন। এই প্রক্রিয়ার নামই এসআইআর। তার পরেই তৈরি হয় সংশোধিত ভোটার তালিকা।

যেহেতু সামনেই বিহার বিধানসভা নির্বাচন, তাই এ রাজ্যে হয়ে গিয়েছে এসআইআর। বিহারের ক্ষেত্রে ১১টি নথি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল কমিশন। অন্যান্য রাজ্যেও এই ১১টি নথিই মান্যতা পাবে বলে ধারণা এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের। এই ১১টি নথি হলো, কোনো ভোটার কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্মচারী কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী হলে সেই পরিচয়পত্র, ভোটারের নামে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগের কোনো সরকারি নথি, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এলআইসি-র নথিও চলবে, জন্মের শংসাপত্র, বৈধ পাসপোর্ট, যে কোনো বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া শিক্ষা সংক্রান্ত শংসাপত্র যেখানে জন্মের সাল ও তারিখের উল্লেখ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ী বসবাসকারীর শংসাপত্র, তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হলে তার শংসাপত্র, এনআরসি তালিকায় নাম, বনাঞ্চলের অধিকারের শংসাপত্র, রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের তৈরি করা পারিবারিক রেজিস্টার এবং সরকারের দেওয়া জমি বা বাড়ির নথি, যেমন দলিল, পরচা ইত্যাদি।

এসআইআর নিয়ে একগুচ্ছ মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতের তরফে নির্বাচন কমিশনকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় আধার, ভোটার আইডি এবং রেশন কার্ডকে নথি হিসেবে বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এর পরেই কমিশনের তরফে আদালতকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে এগুলিকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। কমিশনের যুক্তি, আধার আদতে একটি পরিচয়পত্র, নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এসআইআর পর্বে নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে ভোটার আইডি-ও প্রামাণ্য নথি নয়। একই যুক্তিতে বাদ গিয়েছে রেশন কার্ডের মান্যতাও। পরে অবশ্য বিহারের ক্ষেত্রে ১২তম প্রামাণ্য নথি হিসেবে আধারকে মান্যতা দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে পাঠানো চিঠিতে প্রস্তাব দেন, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হলে রেশন কার্ড এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকেও নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি হিসেবে গ্রহণ করা হোক। রাজ্যের দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাদের সাফ কথা, আধার কার্ডের পরে আর কোনো নথি গ্রহণ করা হবে না। সারা দেশেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

কমিশনের এহেন কড়া সিদ্ধান্ত জানার পর বিপাকে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল। কারণ বিহারে এসআইআর চালু হওয়ার পরপরই তালিকা থেকে বাদ গিয়েছিল ৫২ লক্ষ ভোটারের নাম। প্রক্রিয়া শেষে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ লক্ষ। এতেই অশনি সংকেত দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, শেষবার রাজ্যে এসআইআর হওয়ার পর বন্যার জলের মতো বাংলাদেশ থেকে আসতে থাকে অনুপ্রবেশকারী দল। বাম জমানায় কুর্সি ধরে রাখতে তাদের 'বানিয়ে দেওয়া' হয়েছে এ রাজ্যের বাসিন্দা। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের হটিয়ে রাজ্যের তখতে বসেন মমতা ব্যানার্জি। ব্যস, তার পরেই পোয়া বারো বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের। পঙ্গপালের মতো এ দেশে ঢুকতে থাকে তারা। তাদের ভিড়ে মিশে গিয়েই বাংলা হয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে রোহিঙ্গারাও। ভোটব্যাংক ধরে রাখতে কংগ্রেসের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেস শুরু করে তুষ্টীকরণের রাজনীতি। এই সব মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের রাতারাতি বানিয়ে দেওয়া হয় ভারতীয়। রাজ্যের ইতিউতি গজিয়ে ওঠে জাল নথি বানানোর চক্র। সেখান থেকে ভুয়ো নথি বানিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তারা। মুসলমান তোষণের এই রাজনীতি এবং ভুয়ো ভোটারদের হাতযশের সুফল কুড়োতে শুরু করে তৃণমূল অ্যান্ড কোং। যার জেরে রাজ্যের কোনো উন্নয়ন না করেও টানা ১৫ বছর নবান্নের ১৪ তলায় নিশ্চিন্তে ঠাণ্ডা ঘরে বসে রয়েছেন বিভিন্ন 'শ্রী'-র স্রষ্টা।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বলতে কিছুই নেই। তাই কাজও নেই। অগত্যা ভিটে-মাটি ছেড়ে ভিন রাজ্য কিংবা অন্য দেশে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে যাচ্ছেন বাঙ্গালিরা। এঁদের এই রাজ্যে ফেরাতে ফি মাসে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর রাজ্যবাসীর যে বিরাট অংশ কর্মহীন, নাম-কা-ওয়াস্তে নানারকম ভাতা দিয়ে বছরের পর বছর ধরে কার্যত তাঁদের পঙ্গু করে রেখেছেন। প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ৩৩ টাকার ভাতার (তফশিলি জাতি-উপজাতি হলে অবশ্য টাকার অঙ্কটা খানিক বেশি) আশায়ই ঘাসফুল আঁকা বোতামে চাপ দিয়ে চলেছেন অসহায় পশ্চিমবঙ্গবাসী।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজ্যে এসআইআর হলে বাদ যেতে পারে কম-বেশি এক কোটি ভোটারের নাম। যার অর্থ, প্রায় ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ থুবড়ে পড়বে তৃণমূল। এই সংখ্যক ভুয়ো ভোটার বাদ গেলে আদতে লাভবান হবে বিজেপিই। কারণ রাজ্যে কংগ্রেস এবং সিপিএম শূন্য। সিপিএমকে ফিরিয়ে ফের একবার অত্যাচারের শিকার হতে চান না রাজ্যবাসীর সিংহভাগ অংশ। হাতে রইল কংগ্রেস। রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে তার তো কোনো সংগঠনই নেই। তাই তৃণমূলের একমাত্র বিকল্প সেই আদি-অকৃত্রিম বিজেপিই।

এই আঁক কষেই ভয়ে থরহরি কম্পমান তৃণমূলের ভোট ম্যানেজারদের। তৃণমূল জমানায় যাঁরা 'করেকম্মে' খাচ্ছেন, তাঁরাও নিশ্চিন্তে নেই, জল মাপছেন। নির্বাচনের আগে হাওয়া মোরগের মুখ যদি বিজেপির দিকে ঘুরে যায়, তাহলে ঝাঁপ মারতে তাঁরা প্রস্তুত। এমনতর আশঙ্কা থেকেই ভোটারদের মনে ভয় ধরাতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এনআরসি হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এনআরসি-র 'জুজু' দেখিয়ে বাতপতাকার মুখ বিজেপির দিক থেকে তৃণমূলের দিকে ঘোরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন 'বঙ্গেশ্বরী' (নিন্দুকরা অবশ্য বলেন 'ব্যাঙ্গেশ্বরী')।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের কাজ শুরু হবে পূজার পরে। যদিও নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, তামিলনাড়ু, কেরল ও পুদুচেরিকেও সেপ্টেম্বরের মধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। অক্টোবর মাসে জারি হতে পারে এসআইআর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মাসের প্রথম দিকেই শেষ দুর্গাপূজা। কালীপূজা- ভাইফোঁটার পর্ব চুকতে আরও দিন পনেরো। তার পরেই জোরকদমে শুরু হয়ে যাবে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া। এই পাঁচ রাজ্যে আগেই শুরু হবে সংশোধন প্রক্রিয়া। কারণ বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে এই রাজ্যগুলিতে।

জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকারীন প্রতিটি বুথে থাকবেন একজন করে সরকারি আধিকারিক। এঁরা বিএলও। এঁদের কাছে সশরীরে হাজির হয়ে ভোটারদের জমা করতে হবে নথি। বুথগুলিতে কী কী নথি জমা পড়ল, তা যাচাই হবে বিধানসভাভিত্তিক। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একজন করে সরকারি আধিকারিক ওই কাজ করবেন। পরে তা যাচাই করা হবে জেলাস্তরে। তার পরেই তা পাঠানো হবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে।

এসআইআর কার্যকর করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছতে হবে বিএলওদের। কোন বাড়ির কতজন সদস্য, তাঁদের মধ্যে কে মারা গিয়েছেন, অন্যত্রই বা থাকেন কে— নথি-সহ সেই সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে এসআইআর সংক্রান্ত ফর্ম। নির্দিষ্ট সময়ের পরে পূরণ করা সেই ফর্ম সংগ্রহ করে জমা দিতে হবে কমিশনকে, বিএলও গিয়ে যদি দেখেন, কোনো বাড়িতে তালা দেওয়া রয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি ওই বাড়িতে এসআইআর সংক্রান্ত ফর্মটি রেখে দিয়ে আসবেন। ওই বাড়ির কারও ফোন নম্বর জোগাড় করে সংগ্রহ করে তাঁকে জানাতে হবে বিষয়টি। পরিবারের সময় নিয়ে সেই বাড়িতে একাধিকবার যেতে হবে। ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে বিএলওদের। এজন্য ডাউনলোড করে রাখতে হবে 'বিএলও অ্যাপ'। এই অ্যাপের মাধ্যমেই জমা দিতে হবে তথ্য। যেসব ক্ষেত্রে দেখা যাবে ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড যোগ করা নেই, সেক্ষেত্রেও বিএলওদের সংশ্লিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্তীকরণের ফর্মও পূরণ করতে হবে।

কমিশনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বুথ এলাকায় প্রবীণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে, যাঁদের নির্দিষ্ট এলাকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রয়েছে। যাঁরা জানেন, কোন পরিবারের কে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, মারাই বা গিয়েছেন কে। তার ফলে সমীক্ষার কাজ হবে মসৃণ। তবে ভোটার সমীক্ষার মূল কাজটি কিন্তু করতে হবে বিএলওদেরই। □

ভারতকে বাঁচাতে হলে অনুপ্রবেশে লাগাম দেওয়া জরুরি

ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ সহজ, কারণ বিরোধী দলগুলি বিজেপিকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য চান।

অমলেশ মিশ্র

কয়েকদিন আগে টিভি চ্যানেলে দেখলাম যে লন্ডনে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডবাসীরা বিশাল মিছিল করেছেন। শুনলাম— পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী খুব কড়া ভাষায় বললেন যে এখন অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন দেশের খুবই প্রয়োজন।

দেশকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে হবে। আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি মুসলমান ও মায়ানমারের রোহিঙ্গারাই প্রধান। রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বিশেষ জানা থাকলেও মুসলমানদের ব্যাপারটা বিলক্ষণ জানি। মুসলমানদের প্রধান দুটি কাজ--- (১) অমুসলমানদের ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমান বানানো, (২) অমুসলমান দেশকে (দার-উল্-হারব) মুসলমান দেশ (দার-উল্- ইসলাম) বানানো। একাজে হত্যা করা কোনো পাপ বা অপরাধ নয়।

ইসলামি নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মজহব। ওটিইস নাকি একমাত্র সাচ্চা। অমুসলমানকে মুসলমান করার জন্য 'জেহাদ' অস্ত্র। 'জেহাদ' হলো খোদার— আল্লার পথ। এই হলো কথিত মজহবি পুস্তক কোরানের নির্দেশ।

ইসলামে আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রথম সুরায় অতি সামান্য গন্ধ পাওয়া যায়। অমুসলমানদের পাপ, পুণ্য,

বিশ্বাস-অবিশ্বাস ---এর সঙ্গে ইসলামের পাপ, পুণ্য ইত্যাদির কোনো মিল নাই। জেহাদে হত্যা করলে, অমুসলমানকে হত্যা করলে পাপ হয় না। অমুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা পাপ নয়। অমুসলমানদের সম্পত্তি এমনকী নারী লুঠ করলেও তা বৈধ।

বিশ্বের মানদণ্ডের সঙ্গে ইসলাম মানদণ্ড কখনও এক নয়। যে দেশে ইসলামির সংখ্যা বেশি সে দেশে অন্য কোনো উপাসনা পদ্ধতির কেউ থাকবে না। শতকরা দুই-চার জন হতে পারে। যে দেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সে দেশকে কবজা করার লক্ষ্যেই অনুপ্রবেশ। জনসংখ্যা যদি মুসলমানদের বেশি হয় তবে সেটি ইসলামি দেশ হবে। আরও একটি বিষয় হলো জনসংখ্যার অনুপাতে পরিবর্তন— যাকে ইংরাজিতে বলা হয় Demographic Change। যে দেশে তারা কম সেদেশে প্রথমে ছোট খাটো গণ্ডগোল করবে পরে তা বড় গণ্ডগোলে রূপান্তরিত করবে যাতে সরকারকে অস্থির করা যায়। জনসংখ্যার পরিবর্তন আনতে অনুপ্রবেশ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। আমরা হয়তো জানি যে মুসলমানরা ৪ টি বৈধ বিবাহ করতে পারে এছাড়াও অনেক নারীর সঙ্গে যোগ রাখতে পারে।

মহিলাদের বিষয়ে কথিত মজহবি পুস্তকে বলা হয়েছে যে নারীরা পুরুষদের শস্যক্ষেত্র, পুরুষেরা সেখানে যেমন খুশি গমন করতে পারে। তাহলে হিসাব করুন যে আপনি একজন অমুসলমান হয়ে বছরে ১ টি সন্তান-সন্ততি পাবেন, একজন মুসলমান বৈধ চার স্ত্রীর সহযোগে চারটি সন্তান সন্ততি পাবেন। আপনার ক্ষেত্রে ১-২-৩-৪ বৃদ্ধির হার। আর মুসলমানদের ৪-৮-১৬। সাধারণত অমুসলমানরা আর্থিক কারণে ও সচ্ছলতার আশায় জন্মহার কম রাখেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ তৈরির বিষয়টিও তারা ভাবেন। মুসলমানরা বৈধভাবেই চার জন স্ত্রী রেখে থাকে, এছাড়াও হারেম গোছের কিছু আছে — যার মাধ্যমেও মুসলমান সংখ্যা বাড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় মুসলমান সংখ্যা বেশি। জন প্রতিনিধি গর্ব করে বলেন — আমরা ৭০ হিন্দু ৩০। তারা হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দিতে পারেন। মালদহ, নদীয়া, কোচবিহার এর মতো কোনো কোনো জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ছে। লক্ষ্য — আর একটু বাড়িয়ে নিয়েই ১৯৪৬ - এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং - এর রাস্তায় যাবে। কোনো এক মুসলমান দায়িত্বশীল মন্ত্রী গর্ব করে বলেন যে তার এলাকায় মিনি পাকিস্তান আছে। কলকাতায় মুসলমানদের কলোনিও আছে।

ইংলন্ড, ফ্রান্স, পোল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের একটি সুবিধা আছে। তাদের দেশের লোকজন নিজের দেশের স্বার্থকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ দেশের স্বার্থের থেকে অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়। তাই বাংলাদেশের সঙ্গে এই রাজ্যের সীমানায় প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার মুক্ত রেখেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বেড়া দিতে চাইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজি নয়। কারণ অনুপ্রবেশ অব্যাহত রাখবে তাদের প্রয়োজন— ভোটের স্বার্থে।

ভোটার লিস্টের যখন বিশেষ সংস্কার - এর Special intensive Revision (SIR)-এর কথা উঠল ওদের মাথায় যেন বাজ পড়ল। চিলচীৎকার করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঐ দলের একজন দলীয় সভায় বলছেন যে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সবই তারা বানিয়ে দেবেন। যেতে হবে জাকির দার কাছে। উনি জালিয়াতির ব্যাংক যেন।

ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ সহজ, কারণ বিরোধী দলগুলি বিজেপিকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য চান। তারা সম্ভবত যোগেন মণ্ডলের কথা জানেন না। দেশ বিভাগের সমর্থক যোগেন মণ্ডল দেশ বিভাগের সমর্থক যোগেন মণ্ডল দেশ বিভাজিত হওয়ার পর পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই তাকে লুকিয়ে ভারতে ফিরে আসতে হয়েছিল। আজ যে সমস্ত রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের উৎসাহী — তাঁরা কি ভাবেন যে এদেশটি ইসলামায়িত হলে তাঁর দল থাকবে? তাঁর নেতৃত্ব থাকবে? যদি ভেবে থাকেন তবে যোগেন মণ্ডল মশাইয়ের দিকে তাকান।

আরবি ভাষায় কিন্তু এমন কোনও শব্দ নাই — যা 'গণতন্ত্র' শব্দের প্রতিশব্দ হতে পারে। অতএব হিন্দু নেতা ইসলামি শাসনে হয় মুসলমান হবেন অথবা ইসলামিদের তল্পিবাহক হবেন। আর কোন বিকল্প নেই।

বিশ্ব বিশ্রুত বার্ট্রান্ড রাসেল Theory and pratice of Bolshevism-এ লিখেছেন---Mohammedanism and Bolshevism are practical, social, unspiritual concerned to win the empire of the world. "Among religions, Bolshevism (communism) is to be reckoned with Mohammedanism rather than with christanity, Buddhism and Hinduism. Christianity, Buddhism and Hinduism are primarily personal religions with mystical doctrines and love of contemplation.

বলশেভিকবাদ (মার্কসবাদ) এবং ইসলাম--- বাস্তববাদী, সমাজবদ্ধ, আধ্যাত্মিকতাহীন--- কেবল বিশ্বটা জয় করতে চায়, তাদের শাসনাধীন করতে চায়।

রিলিজিয়নগুলির মধ্যে মার্কসবাদকে মহম্মদবাদের সঙ্গে একই মতবাদ হিসেবে ভাবা যায়; খ্রিস্টবাদ, বৌদ্ধমত বা হিন্দুত্বের সঙ্গে নয়। খ্রিস্টবাদ, বৌদ্ধমত, হিন্দুত্ব প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক--- কিছুটা রহস্যময় এবং আত্মোন্নতির প্রতি ভালোবাসা। (আত্মোন্নতি অর্থে আধ্যাত্মিকতা)। ১৯৯০-৯২ সালের মধ্যে সোভিয়েতে সাম্যবাদ পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম হয়নি। এবং মনে হয় ইসলামের সঙ্গে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের শেষ যুদ্ধ হবে।

আরবি ভাষায় গণতন্ত্র শব্দটি নাই। আর সারা বিশ্বের ইসলামি দেশগুলি বাদ দিলে সবাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পছন্দ করে। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এখন অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।

এখন অসংগঠিত হিন্দুদের (ভারতে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামবাদের প্রধান অস্ত্র অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াইর প্রস্তুতি নিতে হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর একটি কাগজে পড়লাম— ১৬ হাজার বিদেশিকে ভারত ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে— এদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীরা রয়েছে। □

কালার রেভোলিউশন : ক্ষমতা বদলের আমেরিকান কৌশল কি এবার ভারতে?

বিপ্লব বিকাশ

সেদিন শ্যামবাজার পাঁচ মাথা মোড় থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে যাওয়ার পথে এই প্রতিবেদকের একটি অভিজ্ঞতা হলো। কানে এল একটি বয়স্ক কণ্ঠ। সেই কণ্ঠস্বরে শুনলাম যে আমাদেরকে গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে। ভোটার তালিকায় এসআইআর এবং ভোট চুরি নিয়ে তিনি বলছিলেন। জনগণকে স্বাক্ষর অভিযানে যোগ দেওয়ার ডাক দিচ্ছিলেন। কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী বড়ো ছাতা নিয়ে তিন-চারটি চেয়ার পেতে বসেছিলেন। স্বাক্ষর অভিযানে জনগণের উপস্থিতি আর দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু একটি ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ক্রমাগত প্রচেষ্টা স্পষ্ট দেখা গেল। একটু মনে করলেই বোঝা যাবে, বিরোধী দল নির্বাচনে হেরে গেলেই হঠাৎ করে 'ভোটে কারচুপি'র অভিযোগ তুলতে শুরু করে। এটা নিছক ক্ষোভ নয়, বরং এক সুপরিকল্পিত কৌশল, যা সারা বিশ্বে 'কালার রেভোলিউশন' নামে পরিচিত। নাম শুনে মনে হতে পারে এটা কোনো স্বপ্ন বা আশা, কিন্তু বাস্তবে এটি গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল করে বিদেশি স্বার্থকে শক্তিশালী করার এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।

এর ফর্মুলা খুব সহজ। প্রথমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে কলঙ্কিত করো, তারপর জনগণের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে অবিশ্বাস ছড়াও। দ্বিতীয় স্তরে প্রতিবাদ চলবে, আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে নন-ভায়োলেন্ট প্রোটেস্ট বা অহিংস প্রতিবাদ দেখা যাবে। এরপরের স্তরে একদল উন্মত্ত জনতাকে রাস্তায় নামাও এবং বিদেশি সমর্থনের জোরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারকে উলটে দাও। এক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে উপড়ে ফেলে ভিড়তন্ত্র।

বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ২০০৩ সালে জর্জিয়ায় 'রোজ রেভোলিউশন' ঘটেছিল। নির্বাচনে এডওয়ার্ড শেভারনাদজে জিতলেও বিরোধীরা কারচুপির অভিযোগ তোলে। মাসের পর মাস বিক্ষোভ চলল এবং শেষ পর্যন্ত শেভারনাদজেকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। একই ধাঁচে, ২০০৪ সালে ইউক্রেনে 'অরেঞ্জ রেভোলিউশন' সংঘটিত হয়। ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ভোটে জিতলেও পাশ্চাত্য ও মার্কিন শক্তির কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। নির্বাচনকে 'ফ্রড' আখ্যা দিয়ে মাঠে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে বসিয়ে রাখা হয়। আমেরিকা ও ইউরোপ বিরোধী শিবিরকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেয়। শেষে পুনর্নির্বাচন হলো এবং সরকার বদলে গেল।

২০০৫ সালে কিরগিজস্তানে 'টিউলিপ রেভোলিউশন' ঘটল। ভোট কেনা-বেচার অভিযোগে সংসদ দখল, রাষ্ট্রপতির পালিয়ে যাওয়া এবং নতুন সরকারের ক্ষমতা দখল— সবই ঘটল ওই একই ছকে।

এরপর আরব স্প্রিং। ২০১১ সালে তিউনিশিয়া থেকে মিশর ও লিবিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আন্দোলনের আগুন। এনজিও আর সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে আন্দোলন গড়ে তোলা হলো। অজুহাত আলাদা হলেও উদ্দেশ্য ছিল এক— ক্ষমতা বদল।

২০২০ সালে বেলারুশে লুকাশেঙ্কো জেতার পর বিরোধীরা বলল, 'ভোট চুরি হয়েছে'। পাশ্চাত্য দুনিয়ার সমর্থন নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ রাজধানীতে বিক্ষোভ চলল। ২০২২ সালে কাজাখস্তানে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ, মুহূর্তেই সরকার ফেলার চেষ্টায় রূপ নিল। পরে জানা গেল, এনজিও আর বাইরের শক্তি সক্রিয় ছিল পর্দার আড়ালে।

বাংলাদেশ ও নেপালেও সাম্প্রতিক ঘটনায় একই ছক দেখা গিয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, যেখানে আমেরিকা নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করতে চায়, সেখানেই নির্বাচনের পর ধ্বনিত হয় 'নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ' এবং অসংখ্য মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতেও বহুবার ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলে বা ভোটচুরির মিথ্যে অভিযোগ তুলে এমন চেষ্টা হয়েছে। তবে সফল হয়নি। কারণ ভারত ১০-২০ কোটি মানুষের ছোটো দেশ নয়, বরং এক বিশাল ও পরিপক্ব গণতন্ত্রের দেশ। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হলো ভারত। এদেশের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন, তাই বিদেশি ষড়যন্ত্র ও কৌশল এখানে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

আজও বিদেশি মদতে ভারতের মাটিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার খেলা চলছে। বিরোধীদের আনা অভিযোগ, গোপন বৈঠক আর বিদেশি সেতুবন্ধন— সবই সেই পুরনো ছক। রাহুল গান্ধীর নিয়মিত বিদেশে যাতায়াত, সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে তার গোপন বৈঠক এবং মিটিং ও সেটিং করে দেশে ফিরে আসার পর ভারতে প্রতিবার পুরনো মডেলের একটি করে নতুন নাটক যে আরম্ভ হয়ে যায়, সেটা জনগণ ভালোভাবেই বুঝতে পারছে।

জনগণের সতর্কতা এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের তৎপরতায় বিরোধী পক্ষের যাবতীয় ছক ধরা পড়ে যাচ্ছে। ফলে এই নাটক শুরু হলেও কয়েকদিন পরেই ভেস্তে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, 'কালার রেভোলিউশন' গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে না, বরং তাকে ভেঙেচুরে বিদেশি স্বার্থের দাসে পরিণত করে। তবে ভারতীয় জনগণ যদি সদাসচেতন থাকে, তবে যতই বিরোধী শিবির ও বামপন্থী-কংগ্রেসি ইকোসিস্টেম বিদেশি ডলারে ভেসে যাক, বিদেশি ও আভ্যন্তরীণ শত্রুদের থেকে ভারত নিরাপদ থাকবে তার পরিণত গণতন্ত্র এবং সজাগ জনগণের কারণে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৩৬)

'বিদ্যার্থী মণ্ডল'

নিরন্তর কোনো না কোনো সামাজিক স্বরাজ লাভের কাজে যুক্ত থাকতে হবে, সাংগঠনিক বা সেবা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হবে— এটাই ছিল ডাক্তারজীর ধ্যেয় বা একরকম সহজাত স্বভাব বৈশিষ্ট্য। তখন নাগপুরে অনেকগুলি বিদ্যার্থী মণ্ডল গড়ে উঠেছিল। তাদের প্রায় সবার সঙ্গে ডাক্তারজীর যোগাযোগ ছিল। তিনি নিয়মিত তাদের মধ্যে যেতেন এবং তাদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, রাজনীতির সম্বন্ধে আলোচনা, হাতে লেখা মাসিক পত্রিকার প্রকাশন, সরকার বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ সমূহ পাঠ করা এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আন্দামানের ভয়ংকর কারাজীবন থেকে মুক্ত অসুস্থ শ্রীবাবারাও সাভারকরের সঙ্গে বৈঠক-আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত তরুণদের মধ্যে বিপ্লব চেতনা জাগানো ছিল একটা বড়ো উদ্দেশ্য।

'স্বাতন্ত্র্য' পত্রিকার কাজ সমাপ্ত, তাই এদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন ডাক্তারজী। একবার এদের কয়েকজনকে সাঁতার শেখাতে উদ্যোগী হলেন তিনি। উদ্দেশ্য তাদের মনের কাছে পৌঁছোনো। সাঁতার শেখার জন্য তিনি এক বন্ধুর কুয়ো স্থির করেছিলেন। কুয়ো অর্থে আমরা যা বুঝি এ তা নয়। বিশাল বাঁধানো গোলাকার জলাশয়, খুব বড়ো ইঁদারা আরকী! এতে বাড়ির মতো উঠা-নামার সিঁড়ি থাকে। একদিন ডাক্তারজী যখন সাঁতার শেখাচ্ছিলেন, তখন বারো-তেরো বছরের এক বালককে পাশ দিয়ে যেতে দেখে ডাক্তারজী কৌতুক করেই বললেন— 'সাঁতার শিখবে নাকি'? আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটি সাঁতার জানে না, তবু এক কথায় এগিয়ে এল। সত্যি সত্যি ডাক্তারজীকে অন্যের মতো তার কোমরে দড়ি বেঁধে দিতে হলো— সে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়োতে। তার সাহস দেখে ডাক্তারজী খুব আনন্দিত হলেন। পরে তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। ওই বালক ছিল শ্রীগোপালরাও এয়ারকুন্টওয়ার। পরবর্তীকালে সে সঙ্ঘের কাজ করতে প্রচারক হিসেবে জীবন সমর্পণ করে। সেদিনের প্রসঙ্গে এয়ারকুন্টওয়ার বলেন— কুয়োর কাছে ওই অপরিচিত শ্যামবর্ণ মানুষটির উজ্জ্বল চোখের মধ্যে আমি যে তেজ ও আকর্ষণ ক্ষমতা দেখলাম, তার ছাপ আমার মনের উপর একেবারে স্থায়ীভাবে বসে গেল। অপরের মধ্যে এমন মুগ্ধ আকর্ষণ সৃষ্টি করা ডাক্তারজীর ছিল তাঁর সহজাত গুণ।

(৩৭)

লক্ষ্যভেদের ঘটনা ও কর্মযোগ

কলকাতায় থাকাকালীন ডাক্তারজী বন্দুক চালাতে শিখেছিলেন। তিনি এই দৃঢ় ধারণা পোষণ করতেন যে অনুশালন, সঞ্চলন ও লক্ষ্যভেদ, পরাধীন দেশের মানুষকে স্বত্ব বজায় রাখার উপযোগী বিষয়। তাই ডাঃ মুঞ্জের 'রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন'-এ ডাক্তারজী অংশ নিতেন। সুযোগ পেলে বন্ধুবর শ্রীভাউসাহেব টলোটুলের সঙ্গে শিকারে যেতেন। এ কাজে দু-তিন দিন জঙ্গলেও অতিবাহিত হতো। একদিন বান্নেরা গ্রামে একটি গাছে বেগুন টাঙ্গিয়ে নিশানা লাগাবার প্রতিযোগিতা চলছিল। দেখা গেল একমাত্র ডাক্তারজী নিশানা ভেদ করে সকলকে অবাক করে দিলেন। সে সময় তাঁর এক বন্ধু বন্দুকের কার্তুজ নেই ভেবে বন্ধুকের ঘোড়া টিপে দিতেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডাক্তারজীর গা ঘেঁষে গুলিটি বেরিয়ে গেল। এমন দুর্ঘটনা থেকে প্রাণ ফিরে পেয়ে ডাক্তারজী এ প্রসঙ্গে সর্বদা বলতেন— 'গুলি থাকুক আর না থাকুক ঠাট্টাচ্ছলেও কারোর দিকে তাক করে বন্দুক চালানো উচিত নয়।'

শুধু লক্ষ্যভেদ নয়, নাগপুরে যে কোনো সামাজিক কাজের কেন্দ্রে খুঁজলে ডাক্তারজীকে প্রায়শই পাওয়া যেত। 'মহাল'-এ শ্রীহনুমান মন্দিরে নিত্য সন্ধ্যার প্রার্থনা পর্বে সকলের সঙ্গে তিনি উপস্থিত থাকতেন। আবার স্বাধ্যায় মণ্ডলে গিয়ে আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করতেন। বন্ধুদের বাড়ি প্রীতিভোজে যেমন অংশগ্রহণ করতেন, তেমনি যেখানে সমবয়স্ক ব্যক্তিরা একত্রিত হতো, রাষ্ট্র ও সামাজিক দৃষ্টিতে কোনো কার্যক্রম হতো, সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতেন। এটাই নয়, মদের ভাটিখানার বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করতো তাদের পিঠ চাপড়ে দিতেন। আবার গণেশ উৎসবে আর্থিক সঙ্কুলান না হলেও ছেলে-মেয়েদের চাঁদা দিতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন। ১৯২২ সালের প্রাদেশিক খেলাধুলার জন্য গঠিত প্রাদেশিক সমিতিতেও তার নাম ছিল। প্রকৃতপক্ষে দেশ, রাষ্ট্র সমাজ আর ডাক্তারজী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলেই তা অনুভূতিতে ধরা দেয়।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পূজাবকাশের জন্য স্বস্তিকা কার্যালয় ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই কারণেই স্বস্তিকার ৬ ও ১৩ অক্টোবর, ২০২৫, সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হবে না। ২০ অক্টোবর থেকে পুনরায় স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে।

— স্বঃ সঃ